POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ
هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে।

(সূরা আরফ আয়াত: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 28

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 13 জুলাই, 2023 23 যুল হাজ্জা 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

ঋণ থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

২৩৯৭) হযরত আয়েশা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) নামাযে দোয়া করতেন এবং বলতেন- 'হে আমার আল্লাহ্! আমি পাপ এবং ঋণী হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কোন এক ব্যক্তি বলল, হে রসুলুল্লাহ্! আপনি ঋণী হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে অনেক বেশি আশ্রয় যাচনা করে থাকেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন- মানুষ যখন ঋণী হয়, তখন সে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করে।

আঁ হযরত (সা.) এই দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَ
اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ
الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

অর্থ: হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিপদাবলীর চিন্তা এবং দুঃখ থেকে। আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অসহায়ত্ব ও উদাসীনতা থেকে (অর্থাৎ উপায় থাকা সত্ত্বেও তাকে কাজে না লাগানো) এবং কাপুরুষতা ও কার্পণ্য থেকে। তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অভাব, ঋণের বোঝা এবং মানুষের চাপ থেকে।

(সহী বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ইসতেকরাজ)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৬ মে ২০২২
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের মাঝে থাকে সৃষ্টির প্রতি এক মর্মবেদনা এবং মানব হিতৈষার এক আবেগ।

কুরআন করীম থেকে জানা যায় আঁ হযরত (সা.) কে কিরূপ বিষাদ ও মর্মবেদনা গ্রাস করেছিল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

নবীগণের মাতৃসুলভ মমত্ব`

কুরআন করীম থেকে জানা যায় আঁ হযরত (সা.) কে কিরূপ বিষাদ ও মর্মবেদনা গ্রাস করেছিল। যেমনটি বলা হয়েছে- لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তুমি এই দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে যে, তারা কেন ঈমান আনে না? একথা সত্য যে, প্রত্যেক নবীর মধ্যে তাঁর জাতির সংশোধনের জন্য এক প্রকার বেদনা ও আবেগ অনুভুতি থাকে, কেবল তারা ফাঁকা বুলি নিয়েই আবির্ভুত হন না। আর এই ব্যকুলতার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা থাকে না, বরং সহজাতভাবেই তাঁদের মধ্যে এক অস্থিরতা কাজ করে। যেরূপে মা নিজের সন্তান লালন-পালনের কাজে ব্যস্ত থাকে। বাদশার পক্ষ থেকে যদি তাকে আদেশও করা হয় যে, যদি সে নিজের সন্তানকে স্তনপান নাও করায় আর এই কারণে তার দু-একটি সন্তান মারাও যায়, তবু তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, তার কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। বাদশাহর এমন আদেশ পেয়ে কোন মা কি আনন্দিত হতে পারে? কখনই নয়। বরং সে বাদশাহকে গালি দিবে। সে নিজের সন্তানকে স্তনপান করানো থেকে বিরত থাকতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যটি সহজাতভাবেই তার প্রকৃতিতে মজ্জাগত রয়েছে আর সন্তানকে স্তনপান করানোর বিনিময়ে কখনই সে বেহেশত লাভ বা অন্য কোন প্রতিদানের আশা করে না। তার সেই আবেগ প্রকৃতিগত। অন্যথায় যদি এমনটি না হত, তবে ছাগল, গরু,মোষ সহ বিভিন্ন পশুপাখির মায়েরা নিজেদের শাবকদের প্রতিপালন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত। এটা এক সহজাত প্রবৃত্তি, একটা বিবেক ও আবেগ অনুভুতির বিষয়। মায়েদের নিজেদের সন্তানদের প্রতিপালনের কাজে নিয়োজিত থাকাই তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে খোদার পক্ষ থেকে যে সব প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ এসে থাকেন তাঁদের প্রকৃতিতেও একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। সেটি কি? সেটি হল সৃষ্টির প্রতি এক মর্মবেদনা এবং মানব হিতৈষার এক আবেগ। প্রকৃতিগতভাবেই তাঁরা চান, মানুষ হিদায়াত লাভ করুক এবং এমন এক জীবন লাভ করুক যা খোদার জন্য উৎসর্গীত।

(মালফুযাত,১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৩)

অহংকারী ব্যক্তি মনে করতে শুরু করে যে, সে উন্নতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছে আর এর ফলে বেশি উন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়। অহংকার করো না, তোমার মাঝে যদি কোন জাগতিক গুণ থাকে তবে তার দ্বারা জাতির উপকার কর যাতে জাতির সর্দার হতে পার আর যদি ধর্মের বিষয়ে কোন গুণ থাকে তবে তারা দ্বারা জাতির উপর করা যাতে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে প্রিয়ভাজন হও।

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ
اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا

সূরা বনী ইসরাইলের ৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

প্রথমে সেই সব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলির সঙ্গে খোদা তা'লা কিম্বা অন্যান্য মানুষের সঙ্গে। এখন সেই সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা তাঁর সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। যেমনটি বলা হয়েছে, যদি তোমাদের মাঝে কোন গুণ থাকে তবে সেটিকে নিয়ে অহংকার করো না। কেননা এর ফলে তোমরা পুণ্য থেকে বঞ্চিত হবে এবং ভবিষ্যতে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবে না। কেননা যার মধ্যে অহংকার এসে যায়, সে মনে করতে শুরু করে যে, আমি উন্নতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছি আর এর ফলে বেশি উন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয়, এতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হে মানব! তোমার সাফল্য, মানবীয় সাফল্যের অধিক নয়। তাই ততটাই আনন্দিত হও যা মানুষের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আর একথা স্মরণ রেখো যে, তুমি উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছানো সত্ত্বেও পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না। অর্থাৎ এর বাইরে যেতে পারবে না। আরবী প্রবাদ خَرَقَ الْمَفَازَةَ অর্থাৎ জঙ্গলের পথ পেরিয়ে বের হয়ে গেল। এখানেও একই অর্থ প্রযোজ্য আর এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাকে এই পৃথিবীতেই থাকতে হবে, তোমার উন্নতিকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। অতএব, নিজেকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেও না যে, অন্যান্য মানুষ ছাড়া তোমার চলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যারা অহংকারী মানুষদের দেখার সুযোগ পেয়েছে, তারা জানে যে, অহংকারী ব্যক্তির জীবন চরম যন্ত্রণায় কাটে। কেননা, একদিকে সে নিজেকে এক বিচিত্র কিছু মনে করে বসে। অপরদিকে সে নিজের দেশ ও দেশের মানুষদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে বাধ্য হয়। তাই এক বিচিত্র বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে তার জীবন কাটে। বর্তমান যুগের যে সব ইংরেজি ঘেঁষা লোকেরা নিজেদেরকে অন্যান্য ভারতীয়দের চায়তে উৎকৃষ্টতর মনে করে থাকে অথচ ইউরোপিয়ানরা তাদেরকে পাত্তাও দেয় না, তারাও এই আযাবে নিপতিত। যারা তাদের নিজের, তাদের সঙ্গে থাকা পছন্দ নয় আর যাদের সঙ্গে থাকতে চায় তারা তাদেরকে তুচ্ছ মনে করে। তাই বলা হয়েছে, তোমাদের নিজেদের লোকদের মাঝেই থাকতে হবে। অতএব, মনের অবস্থা এমন করে তুল না যাতে তোমার জীবন তোমার নিজের জন্য বোঝা হয়ে ওঠে। (এরপর ২ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আমরা কেবল নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তবলীগ করি না, কাউকে ইসলাম তথা আহমদীয়াত গ্রহণের আহ্বান করে লাভ কি যদি না তার মাঝে সংশোধনের ইচ্ছেশক্তি-ই না থাকে?

আল্লাহ্ তা'লার তৈরী নীতিমালা এবং মানুষের তৈরী নীতিমালার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আপনি তাদের বলে দিন, তাদেরকে একথা বুঝতে হবে যে, আরও একটি জীবন রয়েছে যেটি মৃত্যুর পর লাভ হবে, সেটিই হবে শাশ্বত জীবন।

আপনাদেরকে মানুষের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করতে এবং তবলীগের জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাত এবং সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। মানুষকে আমন্ত্রিত করুন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করুন।

কেবল লিফলেটস বিতরণ করাই যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ পযন্ত আপনি এটা না জানতে পারছেন যে, সেটা পড়বে কারা এবং তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে। অনেক গুলি মাধ্যমের মধ্যে লিফলেট হল একটি মাধ্যম।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০২১ সালের ২৪ শে অক্টোবর তারিখে মজলিস আমেলা জামাত আহমদীয়া আয়ারল্যাণ্ডের সাথে অনলাইন সাক্ষাত

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০২১ সালের ২৪ শে অক্টোবর তারিখে মজলিস আমেলা জামাত আহমদীয়া আয়ারল্যাণ্ডের সাথে অনলাইন সাক্ষাত করেন। ইসলামাবাদের (টিলফোর্ড) এম.টি.এ স্টুডিও থেকে তিনি অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে মজলিসে আমেলার সদস্যরা গ্যালওয়ের মরিয়ম মসজিদ থেকে অন-লাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর উপস্থিত আমেলা সদস্যদের সঙ্গে হুযুর পরিচয় করেন।

মজলিসে আমেলার এক সদস্য প্রশ্ন করেন যে, আপনার মতে বর্তমানের কোরোনা অতিমারি থেকে পৃথিবী কি শিক্ষা নিল?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আয়ারল্যাণ্ডে কেউ কোন শিক্ষা নিয়েছে বলে আপনি আপনার চোখে পড়ছে? এভাবেই হচ্ছে, এমনভাবে দুনিয়াদারি হচ্ছে, তাদের যে ব্যবস্থাপনা ছিল তেমনভাবে তারা চালিয়ে যাচ্ছে। খোদার দিকে তারা প্রত্যাবর্তন করে নি, আর করতেও চায় না। শুধুই মৌখিক দাবি করা হচ্ছে। সম্প্রতি জার্মানীতে এত বন্যা এসেছে, এর থেকে কি তারা কোন শিক্ষা নিয়েছে? কিছুক্ষণের জন্য তারা খোদাকে স্মরণ করেছে। খাওয়ার জন্য যেভাবে লাইনে দাঁড়িয়েছিল এবং হাহাকার করছিল আর যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হল সব কিছু ভুলে গেল। যেভাবে কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যখন তারা কোন বিপদে পড়ে, সমুদ্রের মধ্যে বিপদে পড়ে, তখন তারা আমার দিকে বিনত হয় আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু স্থলে পৌঁছতেই পুনরায় সেই সব অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। তখন তারা ভুলে যায় যে আল্লাহ্ কে আর আমি কে আর তুমি কে!

আমেলার আর এক সদস্য বলেন, অনেক সময় লোকে বলে, ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষা তাদের পছন্দের, কিন্তু তাদের জন্য শরিয়তের বিধিনিষেধ মেনে চলা কঠিন কাজ। এ প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন হল, কাউকে একথা বলার অনুমতি আছে যে, ইসলাম গ্রহণ করে নাও, পরে অবৈধ বিষয়গুলিকে বর্জনের চেষ্টা করবে? না কি তাদেরকে প্রথমেই বলে দেওয়া উচিত যে, ইসলাম গ্রহণ করতে হলে প্রথম থেকেই অবৈধ বিষয়াবলীকে ত্যাগ করতে হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, দেখুন! আমরা কেবল নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তবলীগ করি না, কাউকে ইসলাম তথা আহমদীয়াত গ্রহণের আহ্বান করে লাভ কি যদি না তার মাঝে সংশোধনের ইচ্ছেশক্তি-ই না থাকে? ইসলাম তথা ধর্ম আসলে কি জিনিস? ধর্ম আপনার কাছ থেকে কি চায়? এটাই যে, আপনি নিজের সংশোধান করবেন, আল্লাহ্‌র সামনে বিনত হবেন এবং এর অধিকারসমূহ প্রদান করবেন। এছাড়াও আপনার কিছু নৈতিক কর্তব্যও রয়েছে যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তাই আপনি তাদেরকে বলে দিন, এগুলো হল ইসলামের শিক্ষা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আপনি যদি নিজের জীবনের নিরাপত্তা চান, তবে কেবল একথা ভাববেন না যে ইহকালের জীবনই একমাত্র জীবন। আপনাকে আরও এক জীবনের সম্মুখীন হতে হবে যেটি হবে চিরন্তন জীবন। সেখানে আপনাকে আল্লাহ্ তা'লার সামনে নিজের সমস্ত কর্মের হিসেব দিতে হবে। আপনি যদি ভাল কাজ করে থাকেন তবে প্রতিদান পাবেন আর যদি মন্দ কর্ম করে থাকেন তবে শাস্তি ভোগ করবেন। মোটামুটি আপনাকে বুঝতে হবে যে, এই জীবন চিরস্থায়ী জীবন নয়। আর আপনাকে সব সময় অবশ্যম্ভাবী চিরন্তন জীবনকে সামনে রাখতে হবে যা মৃত্যুর পর এক নব-জীবন লাভের মাধ্যমে লাভ হবে। সেখানে আপনাকে নিজের কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তারা যদি একথাটি বুঝে যায় তবে তাদের ইসলাম আহমদীয়াত অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত এবং নিজেদের সংশোধন করার চেষ্টা করা উচিত। অন্যথায় ইসলাম আহমদীয়াতের মধ্যে কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে লাভ কি? আর সেটা কোন কাজেরও নয়। অন্যথায় তারা আপনাদের ব্যবস্থাপনাটাকেই বিগড়ে দিবে। তারা যেটা চায় সেটাই করবে। তারা ক্লাব ও ক্যাসিনোতে যাবে, মদপান করবে এবং পরকীয়া করবে। এছাড়াও অনেক অপকর্ম রয়েছে যেগুলি তাদের কাছে অনৈতিক নয় এবং তাদের জীবনের অংশ। কিন্তু শরিয়ত এবং ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই সমস্ত মন্দকর্ম বর্জন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার তৈরী নীতিমালা এবং মানুষের তৈরী নীতিমালার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আপনি তাদের বলে দিন, তাদেরকে একথা বুঝতে হবে যে, আরও একটি জীবন রয়েছে যেটি মৃত্যুর পর লাভ হবে, সেটিই হবে শাশ্বত জীবন। তারা যদি একথা বুঝতে সক্ষম হয় তবে ঠিক আছে। নচেত সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে?

সারা দেশে তবলীগি প্রচেষ্টার বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদেরকে মানুষের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করতে এবং তবলীগের জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাত এবং সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। মানুষকে আমন্ত্রিত করুন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করুন। এটা কেবল মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরীর উপরই নির্ভর করছে যে আপনি পুর্ণ উদ্যমে তবলীগ করতে পারছেন কি না। অন্যথায় কেবল লিফলেটস বিতরণ করাই যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ পযন্ত আপনি এটা না জানতে পারছেন যে, সেটা পড়বে কারা এবং তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে। অনেক গুলি মাধ্যমের মধ্যে লিফলেট হল একটি মাধ্যম। আপনাকে সমস্ত পথে চলতে হবে,যাতে আপনি জানতে পারেন যে, আপনাদের পরিস্থিতি অনুসারে আপনারা কিভাবে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় তবলীগ করতে পারেন?

একজন মুবাল্লিগ হুযুর আনোয়ারের কাছে নিবেদন করেন যে, সম্প্রতি তিনি একটি সাইকিলিং ক্লাবে যাওয়া আরম্ভ করেছেন যাতে স্থানীয় লোকদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং আশপাশের মানুষদেরকে তবলীগের জন্য পথ প্রশস্ত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অন্যান্য যুবকদেরকেও এমন ক্লাবে যেতে উৎসাহিত করা উচিত যেখানে তারা স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে এবং নিজেদের ঈমানের উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। আর এভাবে সম্পর্ক তৈরী করে মানুষকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা বোঝাতে পারে।

****

১ম পাতার শেষাংশ.....

لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا। জাবাল এর অর্থ পর্বতও করা হয় আর জাতির নেতা এবং জাতির বিদ্বানকেও বোঝানো হয়। এখানে জাবাল অন্য অর্থে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে যে বলা হয়েছে যে, তুমি জাতির নেতা এবং বিদ্বানের সমকক্ষ হতে পারবে না, এতে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেবাদানের মাধ্যমেই জাতির মাঝে মহান হওয়া যায় বা জ্ঞানের মাধ্যমে মহান হওয়া যায়। আর এই ধরণের মানুষ বিনয়ের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। যেমন আরবী প্রবাদ-

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ অর্থাৎ জাতির সর্দার জাতির সেবক হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে বলা হয়েছে اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا । (আল ফাতির: ৪) অর্থাৎ জ্ঞানী বান্দারাই আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে। অর্থাৎ মানুষের মাঝে জ্ঞান যত উৎকর্ষ লাভ করে, তার মধ্যে খোদাভীতি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। অতএব, এই বাক্যে বলা হয়েছে, অহংকার করে তুমি জাতির নেতা হতে পারবে না, আর জাতির বিদ্বানদের মর্যাদাও পাবে না। কেননা অহংকার তোমাকে নিজের জাতি থেকেই দূরে সরিয়ে রাখে। অতএব, তুমি যদি মহত্বের আকাঙ্খী হও, তবু তুমি অহংকারের কারণে নিজের ক্ষতি করছ। কেননা, এর দ্বারা তুমি নিজেকে সেই বিষয় থেকে বঞ্চিত রাখ যা তোমার হৃদয় বাসনা করে। অতএব, অহংকার করো না, তোমার মাঝে যদি কোন জাগতিক গুণ থাকে তবে তার দ্বারা জাতির উপকার কর যাতে জাতির সর্দার হতে পার আর যদি ধর্মের বিষয়ে কোন গুণ থাকে তবে তারা দ্বারা জাতির উপর করা যাতে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে প্রিয়ভাজন হও।

কি অসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে এখানে অহংকার থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর দৃষ্টান্তও পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ উপস্থাপন কতে পারে না।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৩৫)

জুমআর খুতবা

“তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। ” (মসীহ মওউদ)

“আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন।” (মসীহ মওউদ)

বিরুদ্ধবাদীরাও একথা বলতে বাধ্য হয় যে, আল্লাহ্ তা’লার কর্মগত সাক্ষী তোমাদের সঙ্গে আছে। খিলাফতে হাক্কা ইসলামিয়ার সমর্থনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ২৬ শে মে, ২০২৩, **এর জুমআর খুতবা (২৬ হিজরত ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা’ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা’লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে যখন এই সংবাদ দিলেন যে, পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে, তখন তিনি জামাতের উদ্দেশ্যে বললেন-: খোদাতা’লা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেনঃ- ১। নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন । ২। অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যু র পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রুশক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামা’ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামা’তের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদাতা’লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা’তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ নাগাদ ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদাতা’লার এ ‘মু’জিযা’ দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল। যখন আঁ-হযরত (সা.)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকালমৃত্যু মনে করা হয়েছিল; বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবারাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিলেন।

তখন খোদাতা’লা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) কে দাঁড় করিয়ে পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। এমন ভাবে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যা তিনি করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

অর্থাৎ– ‘এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির অবস্থার পর একে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন’ - (সূরা নূর : ৫৬)।

হযরত মূসা (আ.) এর সময়েও এমনই হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বণী ইসরাঈলদেরকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পূর্বেই মিশর থেকে কেনানের পথে মারা যান। এতে বণী ইসরাঈলের মাঝে তাঁর মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হয়েছিল। তাওরাতে উল্লেখ আছে, বণী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ.)-এর এ অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে চল্লিশ দিন ধরে কান্নাকাটি করেছিল। অনুরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর সময়েও ঘটেছিলো। ক্রুশের ঘটনার সময় তাঁর সব শিষ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলো এবং তাদের একজন ধর্মচ্যুত হয়েছিলো।

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহতা’লার বিধান হচ্ছে, তিনি দু’টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু’টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদাতা’লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতা’লা বলেছেন :-অর্থাৎ- ‘আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা’তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দেবো’ (অনুবাদক)। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস এসে যায়। আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হওয়ার সময় , তবুও সেই সব বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন”।.....

তিনি বলেন, “খোদাতা’লা চাচ্ছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সব সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তার ভক্ত দাসদেরকে এক ধর্মে একত্রিত করেন তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক। এটাই খোদাতা’আলার অভিপ্রায় আর এজন্যেই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর; কিন্তু বিনম্র ব্যবহার, নৈতিক উৎকর্ষ ও দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ সহকারে। যে পর্যন্ত কেউ রূহুল কুদুস বা পবিত্রাত্মা প্রাপ্ত হয়ে দন্ডায়মান না হয় (সে পর্যন্ত) সবাই আমার পরে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে থাক।” (আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৪-৩০৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর তিরোধানের পর আল্লাহ্ তা’লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে জামাতকে হযরত হাকীম মৌলানা নুরুদ্দীন খলীফাতু মসীহ আওয়াল (রা.)এর হাতে একত্রিত করেন। যদিও কিছু লোক চাইত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আঞ্জুমানের হাতে থাকুক। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল কঠোর হাতে সেই ফিতনার মূলোৎপাটন করেন।

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর তিরোধানের পর হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। তিনি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার সময়ও কিছু মানুষ যারা নিজেদেরকে পাণ্ডিত্যে এবং বিচক্ষণতার বিচারে অনেক বড় মনে করত, তারা অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং খিলাফত নির্বাচন প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি না হলেও কয়েক মাসের জন্য মুলতি রাখার চেষ্টা করে যাতে তারা জামাতের মধ্যে বিভেদ তৈরী করার সুযোগ পায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মোমেনীনদের জামাতকে এক হাতে একত্রিত করেন এবং খিলাফতের বিরোধী ও মুনাফিকরা বিফল মনোরথ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় তাঁর খিলাফত কাল ৫২ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সারা বিশ্বে মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জামাতের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকাঠামো মজবুত হয়েছে। এগুলি সবই হয়েছে তাঁর খিলাফতকালে।

এরপর তাঁর মৃত্যুর পর তৃতীয় খিলাফতের যুগের সূচনা হয়। হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) আল্লাহ তা’লার সাহায্য ও সমর্থনে খিলাফতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

অতঃপর ঐশী তকদীর অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কে আল্লাহ্ তা’লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর চতুর্থ খলীফার মর্যাদায় ভূষিত করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা’লা আমাকে মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আর আমার দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা’লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জামাতকে উন্নতির পথে অগ্রসর রেখেছেন। এই সময় কালে শত্রুরা জামাতের মধ্যে বিভেদ তৈরীর, জামাতকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং ভয়ভীত করার অনেক চেষ্টা করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীদের শহীদ করা হয়েছে, জাগতিক প্রলোভন দেখানো হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা আহমদীদেরকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক এবং ঈমানের ক্ষেত্রে ক্রমশ উন্নতি দান করেছেন। এশিয়া হোক বা ইউরোপ,আফ্রিকা বা আমেরিকার আহমদীরা হোক, তাদের মধ্যে প্রত্যেকের খিলাফতের সঙ্গে যে সম্পর্ক রয়েছে তা কেবল আল্লাহ্ তা’লার সৃষ্টি করতে পারেন। জামাতে সদস্যদের খিলাফতের প্রতি যে

নিষ্ঠা ও ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে এবং জামাতের প্রতি যুগ খলীফার যে ভালবাসা রয়েছে তা তৈরী করা কোন মানবীয় শক্তির কাজ নয়। আমি যে দেশেই যাই, সেখানকার দৃশ্যে দেখে এটা বোঝা যায়। আর এটা কেবল মুখের কথা নয়, বরং বর্তমান যুগে ক্যামেরার চোখ এই সব কিছুই নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখছে। এম.টি.এ এমন সব দৃশ্য সম্প্রচার করে থাকে। সেই সব দৃশ্য দেখে বিরোধীরাও একথা বলতে বাধ্য হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার কর্মগত সাক্ষী তোমাদের সঙ্গে রয়েছে।

এরপর হাজার হাজার চিঠি আমার কাছে প্রতি মাসে আসে। এর থেকে একথা প্রকাশ পায় যে পত্র -প্রেরণকারীরা জামাতের সঙ্গে কতটা নিষ্ঠা ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষকে কিভাবে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন এবং কিভাবে মানুষের মনে খিলাফতের প্রতি ভালবাসা ও সম্পর্ক তৈরী করে দেন।

এই মুহূর্তে আমি কতিপয় চিঠিপত্রের নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই যা থেকে প্রকাশ পায় যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার দিকে মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন এবং একথাও মানুষের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পর তাঁর খিলাফতের যে ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রয়েছে তা খোদা তা'লা বিশেষ সমর্থনপ্রাপ্ত।

তানজানিয়ায় মোয়ানযে নামে একটি অঞ্চল রয়েছে। মুয়াল্লিম সাহেব সেখান থেকে রিপোর্ট পাঠিয়ে বলেন যে, একদিন ফজরের নামাযের পর জামাতের সদস্যরা মুবাল্লিগ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসে। যোহরের নামাযের আগে আমরা যখন পুনরায় মসজিদে ফিরি তখন মসজিদের সিঁড়ির কাছে এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পাই। কুশল বিনিময়ের পর জানা যায় যে, তিনি দোয়া করানোর জন্য এসেছেন। সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল, যেভাবে অ-আহমদী মুসলমানদের মধ্যে দম-দরুদ ইত্যাদি প্রথা প্রচলিত আছে, অনুরূপ কাজ আমরাও করে থাকি। আফ্রিকানদের মধ্যে দম -দরুদ প্রথাটি বহুল প্রচলিত। যাইহোক মুরুব্বী সাহেব তাঁকে জামাতের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করেন এবং তাঁর জন্য সেখানে দোয়াও করান। সেই ভদ্রমহিলা বলেন, আমি প্রায় স্বপ্নে দেখি- এক দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী গোঁধুম বর্ণের ব্যক্তি আমাকে সেভাবেই ধর্ম শেখান যেভাবে এই মুরুব্বী সাহেব বুঝিয়েছেন। একথা শোনার পর তাঁকে আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাগণের ছবি দেখানো হয়। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে ধর্ম শেখাতেন তাঁর চেহারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অথবা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) সদৃশ। এরপর সেই ভদ্রমহিলা তাঁর তিন সন্তান সহ বয়আত করে নেন। এই যুগেও খলীফাতুল মসীহ সানির চেহারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সঙ্গে দেখানো হয়েছে।

এরপর ইন্ডোনেশিয়ার পশ্চিম কালতুনান প্রদেশের ঘটনা। সেই এলাকার এক বাসিন্দা হলেন আব্দুল্লাহ। তিনি নিজ স্ত্রী ও সন্তানসহ বয়আত করেছেন। ২০১৯ সাল থেকে জামাতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, মুবাল্লিগ সাহেবের কথায় তিনি বেশ প্রভাবিত হতেন। তাই মসজিদে তাঁর যাতায়াত ছিল। কেননা, তাঁর ধারণা ছিল, এরা অন্যান্য মুসলমানদের থেকে অনেক আলাদা। যাইহোক, আমাদের মিশনের সঙ্গে তাঁর এমন ঘনিষ্ঠতার কারণে এলাকার মৌলবী এবং পাড়ার লোকেরা তাঁর মিথ্যা অপবাদ দিতে শুরু করে দেয়, তাঁকে পাড়া থেকে উচ্ছেদ করে এবং তাঁকে নিজেদের মসজিদেও আসতে দিত না। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি এমন এক ঘুর্ণিপাকে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি যা আমাকে গ্রাস করবে। কিন্তু এক বুজুর্গ আমাকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসেন, যিনি আলখাল্লা পরিহিত ছিলেন এবং তাঁর হাতে লাঠি ছিল। একথা শোনার পর আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব তাঁকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি ছবি দেখায় যেখানে তিনি হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি প্রকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, ইনিই সেই বুজুর্গ যিনি আমাকে নিজের লাঠি দ্বারা ঘূর্ণিপাক থেকে উদ্ধার করেছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁর ছেলেও স্বপ্ন দেখেন। শুধু পিতাই নন, পুত্র-ও স্বপ্ন দেখেছে। সে একাধিক ব্যক্তিকে এই ধরণের আলখাল্লা পরিহিত দেখেছে। একথা শোনার পর আমাদের মুবাল্লিগ তাঁকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর ছবির পাশাপাশি খলীফাগণের ছবিও দেখালে সে বিস্ময়াভিভুত হয়ে বলে, যাদেরকে সে দেখেছিল তাদের মধ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিসও (রাহে.) ছিলেন, খলীফা রাবে (রাহে.)ও ছিলেন এবং আমিও ছিলাম। সে বলল, এরা তো সকলে সেই সব মানুষ যাদেরকে আমি দেখেছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের সকলকে এতত্রিত করেও দেখিয়ে দিলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর পর প্রবর্তিত খিলাফতের ধারা এমন এক ব্যবস্থাপনা যা নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। যাইহোক এই স্বপ্নগুলি দেখার পর তাঁর পরিবার বয়আত করে নেয়। যদি সত্যিকার ব্যকুলতা থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'লা এইভাবেই পথপ্রদর্শনও করে থাকেন।

এরপর ইন্ডোনেশিয়ার দক্ষিণের প্রদেশে বারু নামে একটি জায়গা আছে। আমীর সাহেব লেখেন-একবার আমাদের একবার আমাদের মুবাল্লিগ ফজরের নামায পড়ানোর সময় এক ব্যক্তি জামাতে যোগদানের জন্য আনে। তিনি বলেন, অন্য জায়গা থেকে তিনি এখানে স্ত্রীর আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কথোপকথনের সময় তিনি নিজের অতীতের সমস্যাদীর্ণ জীবনের ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, একবার তিনি কঠিন সময়ে স্বপ্নে শুভ্র পাগড়ি পরিহিত ও শ্মশ্রুধারী এক বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। স্বপ্নের মধ্যে পাগড়ি পরিহিত বুজুর্গ তাঁকে বলেন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ফজরে সদকা-বাক্সে সদকা দিতে থাকবে, এতে তোমার সমস্যাবলী দূর হয়ে যাবে। যেমনটি স্বপ্নে বলা হয়েছিল, তিনি ঠিক তেমনটিই করেন। তিনি বলেন, ২০তম দিন তাঁর সমস্যাবলী দূর হওয়া শুরু হল। একাধিক চাকরী এবং সুযোগ সুবিধা পেয়ে যান। তিনি বলেন, প্রায় তিন মাস পূর্বে শুভ পাগড়ি এবং শ্মশ্রুধারী ব্যক্তিটি পুরনায় স্বপ্নে দেখা দিলেন এবং ফল নেওয়ার জন্য পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে বললেন- এই স্বপ্নটির বিষয়ে কেবল সেই লোককে বলবে যাদের নিজেদের মাঝে তাকওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরপর মুবাল্লিগ সাবে তাঁকে খলীফাগণের ছবি দেখালে সেই ব্যক্তি বিস্ময়ভরে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ছবির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এই ব্যক্তিকে আমি দেখেছি। এরপর তিনি বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হন।

এরপর সিরাজী নামী নিবাসী মালির এক ভদ্রমহিলার ঘটনা। তাঁর সম্পর্কে স্থানীয় মুবাল্লিগ বর্ণনা করেন যে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী। আশপাশে গ্রামে যেখানেই তবলীগের কর্মসূচির বিষয়ে শোনেন, তিনি নিজের সন্তানদের বলেন, আমাকে সাইকেলে করে সেখানে নিয়ে চল। তিনি বলেন, আহমদী হওয়ার পূর্বে তিনি স্বপ্নে দুটি শব্দ শুনতেন। একটি হল আমার খুতবার সঙ্গে পড়া তাশাহুদ এবং সূরা ফাতিহার তিলাওয়াতের কণ্ঠ এবং দ্বিতীয়টি হল সেখানকার মুবাল্লিগ মুআয সাহেবের তবরীগের কণ্ঠ। তিনি বলেন, আমি আকুল হয়ে খুঁজে বেড়াতাম যে এটি কার কণ্ঠ যা আমি স্বপ্নে শুনে থাকি। এখন যখন থেকে জামাত আহমদীয়ার রেডিও অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে এবং রেডিওতে আমার খুতবা এবং তিলাওয়াত শুনেছেন এবং অন্যান্য তবলীগঅনুষ্ঠান শুনেছেন,তখন থেকে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, এটা তো সেই কণ্ঠ যা তিনি স্বপ্নে শুনেছিলেন। আর এটিই তাঁর আহমদীয়াত গ্রহণের কারণ হয়েছে।

ক্যামেরুন অন্য একটি দেশ, সেখানকারও রিপোর্ট রয়েছে। আব্দুর রহমান নামে এক যুবক নিজের আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কয়েক বছর পূর্বে আমি স্বপ্নে আমি দুইজন বুজুর্গকে দেখেছি। তাঁদের মধ্য থেকে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কাজ কর? আমি নিবেদন করি, আমি শহরে মোটর সাইকেল চালিয়ে যাত্রী বহন করি এবং এভাবে আমি নিজের জীবিকা নির্বাহ করি। একথা শুনে অপর বুজুর্গ বলেন, মোটর সাইকেল ছেড়ে এদিকে এসে নামায পড়ান। আমি নামায পড়াই এবং এরপর আমার চোখ খুলে যায়। কয়েকদিন পর আমি বাজারে এক যুবককে পামফ্লেট বিতরণ করতে দেখি, যেগুলি জামাত আহমদীয়ার পামফ্লেট ছিল। বাড়ি এসে আমি সেই পামফ্লেটগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ি এবং তাতে একজন বুজুর্গের ছবি দেখি। ছবিটি ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ)এর যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। এরপর জামাতের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি এবং মুয়াল্লিমের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি আরও বইপুস্তক সংগ্রহ করেন। অপর ব্যক্তিটি প্রথমে যা স্বপ্নে দেখেন, সেই ছবিটিও লিটেরেচারে দেখতে পান আর সেটি আমার ছবি ছিল। তিনি বলেন, দ্বিতীয় ছবিটি ছিল বর্তমান খলীফার। তিনি বলেন, আমি নাম শুনেছিলাম, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু জানতাম না। স্বপ্নে যে ব্যক্তি আমাকে নামায পড়ানোর জন্য বলেছিলেন তিনি ছিলেন জামাতের বর্তমান খলীফা। আর স্বপ্নে আমাকে নামাযের জন্য আহ্বান করা এবং নামায পড়ানোর কল্যাণেই গত বছর যখন আমাদের গ্রামের চিফ মৃত্যুবরণ করলেন, তখন সৌভাগ্যক্রমে তাঁর কোন সন্তান না থাকার কারণে ওসীয়্যত অনুসারে আমাকে গ্রামের চিফ হিসেবে মনোনীত করা হয় আর এইভাবে আমার সম্মান লাভ হয়। আমি মনে করি জামাতের কল্যাণেই আমি এই সম্মান লাভ করেছি।

এরপর গিনি বাসাও আরও একটি দেশ। মুবাল্লিগ ইনচার্জ বলেন, এখানকার এক এলাকার এক ভদ্রমহিলার নাম আয়েশা মারিয়া। তাঁর দুই ছেলে আহমদীয়াত গ্রহণ করলে আয়েশা সাহেবার বড় ভাই, যিনি জামাতের ঘোর বিরোধী এবং আয়েশার পরিবারকে সামলে রেখেছিলেন, আর আয়েশার সংসারে টুকিটাকি জিনিস কিনে এনে দিতেন , তিনি আয়েশাকে ফোন করে সতর্ক করেন এবং বলেন, যদি তোমার ছেলে আহমদীয়াত ত্যাগ না করে তবে তোমাদের সাহায্য করা ছেড়ে দিব আর তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। একথা শুনে আয়েশা বিচলিত হয়ে পড়ে। ছেলেদের ডেকে বলে, আহমদীয়াত ছেড়ে দাও। কিন্তু তাঁর ছেলেরা উত্তর দেয়, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য যথেষ্ট আর আমরা কখনও আহমদীয়াত ত্যাগ করব না। ছেলেদের এই উত্তর শুনে আয়েশা আরও বেশি বিচলিত হয়ে পড়ে। কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না যে সে কি করবে। তিনি বলেন, দুই দিন পর আমি স্বপ্নে দেখি, আমি ভীষণ উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছি এবং অঝোরে কাঁদছি। এমতাবস্থায় শুভ্র পোশাক পরিহিত ও শুভ্র শ্মশ্রুধারী এক ব্যক্তি আমাকে ডেকে ওঠেন এবং কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, চিন্তা করো না, তোমার ছেলেরা এসবের উপরে থাকবে। একথা শোনার পর তাঁর চোখ খুলে যায়। স্বপ্ন দ্বারা তাঁর হৃদয় আশ্বস্ত হয়। সকাল হতেই তিনি আমাদের মিশনারীকে নিজের স্বপ্ন শোনান। আর মিশনারী সাহেব যখন তাঁকে আমার ছবি দেখালেন, তখন তিনি বললেন, এ তো সেই ব্যক্তি যাঁকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম এবং যিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। এখন আল্লাহ্ তা'রার কৃপায় তিনি এখন একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী এবং লাজনার প্রত্যেকটি কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

কেনিয়ারও একটি ঘটনা রয়েছে। নাকোরো অঞ্চলের বাহাতি গ্রামে আমাদের একটি জামাত রয়েছে। এই এলাকাটি খৃষ্টান অধ্যুষিত। ছোট্ট একটি মফসসল শহর। এই মফসসলে অসংখ্য গীর্জা রয়েছে, যার সংখ্যা পায় সাড়ে পাঁচশ আর আহমদী মুসলমানদের একটি মাত্র সেন্টার রয়েছে। এক দিন এক মুসলমান ব্যক্তি আমাদের সেন্টারে এসে নামাযে যোগ দেয়। নামায শেষ করে সে নিজের পরিচয় জানিয়ে বলে তার নাম মহম্মদ আব্দী এবং সে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা। তিনি বলেন, কিছু দিন আগে আমি জানতে পারি যে, এখানে একটি নামায সেন্টার রয়েছে তাই আমি নামায পড়তে চলে এলাম। এরপর তাকে জামাতের পরিচয় দেওয়া হয়, তাতে তিনি এমন কিছু কথা বলেন যা থেকে বোঝা যায় যে তিনি জামাত বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। একদিন রাস্তায় পুনরায় তার সঙ্গে সাক্ষাত হলে মুয়াল্লিম সাহেব তাঁকে বলেন, মুসলমান ভাই আছ বেশ আছ। তোমার কিছুটা মতভেদ আছে, কিন্তু তাতে কি? তুমি নামাযের জন্য আমাদের সেন্টারে নিয়মিত আসবে। যদি কোন সংশয় বা প্রশ্ন থেকে থাকে তবে নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করতে পার, আমরা তার উত্তর দিব। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়াও করতে থাকি যেন তিনি এর বক্ষ উন্মোচন করেন। কয়েকদিন পর মহম্মদ আব্দী নামের সেই ব্যক্তি আমার বাসভবনে আসে। সেই সময় আমার ঘরে এম.টি.এ চলছিল আর এম.টি.এ তে আমার খুতবা হচ্ছিল। অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে সে শুনতে থাকে। খুতবা শেষ হলে সে বলল, আমি বয়আত করতে চাই। তার কথা শুনে আমি ভীষণ আশ্চর্য হই। কেননা, বাহ্যত সে জামাত বিরোধী ছিল, কেন এই অকস্মাৎ পরিবর্তন! বয়আত করার পর আমি তার কাছে কারণ জানতে চাই। সে উত্তরে বলে, গত রাতের শেষ পহরে আমার চোখ খুললে আমি বাইরে উঠোনের দিকে আসি। ঠিক সেই সময় আকাশের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় যেখানে আমি এক উজ্জ্বল বস্তু দেখতে পাই যেটা আমার হৃদয়ে গভীর ভীতি ও প্রভাব ফেলে। আর এখন আমি আপনার কাছে এসে এখানে যখন খলীফার খুতবা দেখলাম, তখন কাল রাতের ছবিটি আমার মনে পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে। এখন আমি সপরিবারে বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি।

কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা একজন বিরুদ্ধবাদীর কাছে আহমদীয়াতের সত্যতাই কেবল প্রকাশ করেন নি, বরং তার মনে খিলাফতের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এটা কোন মানুষের চেষ্টায় সম্ভব নয়।

ক্যামেরুন আরও একটি দেশ যেখানকার একটি শহর হল মারওয়াহ। সেখানে সুলেমান সাহেবা একজন স্কুল শিক্ষক। কেবল চ্যানেলে এম.টি.এর একটি অনুষ্ঠান দেখেন যাতে জামাত আহমদীয়ার খলীফার ছোটদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। এক কিশোর ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে জামাত আহমদীয়ার ইমাম অত্যন্ত সুন্দর ও সহজভাবে এর উত্তর দেন এবং সঙ্গে এও বলেন যে আমি পৃথিবীর পরাশক্তি দেশগুলির প্রধানদের পত্র লিখেছি, তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করেছি যে, যদি এখন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন না করা হয়, পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে। এসব কথা শুনে চিন্তা করছিলাম যে জামাতের কার সাথে যোগাযোগ করব? এমতবাস্থায় একদিন মারওয়াহ শহরের লোকাল টিভিতে সেখানকার স্থানীয় ভাষায় জামাত আহমদীয়ার ইমামের খুতবার অনুবাদ সম্প্রচারিত হচ্ছিল। টিভির পর্দায় জামাতের সদরের ফোন নম্বর ভেসে আসতে দেখে আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। এরপর জামাতের লিটেরেচার পড়ি, খলীফাতুল মসীহ এর 'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ' শীর্ষক বইটি পড়ি। এরপর আমার মন আশ্বস্ত হলে আমি বয়আত করে জামাতে সামিল হয়ে যায়। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, এখন জামাতের একজন অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য।

এরপর সিরালিওন থেকে মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, ইব্রাহিম নামে এক ব্যক্তি জামাতের বিরোধি ছিলেন না, কিন্তু জামাতেও সামিল হন নি। এম.টি.এ তে আমার খুতবা শুনে তিনি প্রকাশ্যে বলতে শুরু করে দেন যে, মৌলবীরা জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে যে শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছেন তা মিথ্যা। আমি নিজে জ ামাত আহমদীয়ার ইমামকে শুনেছি, তিনি কুরআন করীমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি নবী করীম (সা.)-এর নাম উচ্চারণ করেন এবং হাদীস বর্ণনা করেন। আহমদীদের কলেমাও সেই একই। ইসলামের শিক্ষা মেনেই সমস্ত কাজ করে। তবে আহমদী মুসলিম জামাত কিভাবে মিথ্যা হতে পারে? এরপর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেন এবং চাঁদা ব্যবস্থাপনাতেও অংশ গ্রহণ করেছেন। এখন তিনি একজন নিষ্ঠাবান আহমদী।

ত্রিনিদাদ-এর আমীর সাহেব লেখেন- শেরিদা নামে এক নবাগত আহমদী গত বছর স্বামীর সঙ্গে বয়আত করেন। তিনি তাঁর দুই অমুসলিম বোন ও প্রতিবেশীদেরকে বাড়িতে টিভিতে জলসা সালানা ইউকে দেখার আমন্ত্রণ জানান। এরা জলসার সমস্ত ব্যবস্থাপনা দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং বিশেষ করে আমার ভাষণ তাঁদের ভীষণ পছন্দ হয়। তাঁরা বলেন, জামাত আহমদীয়া-ই প্রকৃত ইসলাম আর যদি সমস্ত ইসলামী ফির্কাগুলি এমন হয়ে যায় তবে ইসলাম পৃথিবীতে আধিপত্য অর্জন করতে পারে। তিনি বলেন, আমি খলীফাতুল মসীহকে দেখে কাঁদতে শুরু করি এবং অনুভব করছিলাম যেন তাঁর চরণে বসে আছি। যদিও কিছুকাল পর তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি ওসীয়্যত হিসেবে নিজের বাড়িটি জামাতকে দান করেছেন। এ বিষয়ে কাজ চলছে।

কিরগিযিস্তানের এক স্থানীয় বাসিন্দা সুলতান আতা খানু আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমার ছেলে এবং স্ত্রী আগেই বয়আত করার তৌফিক লাভ করেছিল। আমি ২০১৭ সালে প্রতি জুমআয় জামাতের মিশন হাউসে যাওয়া শুরু করি। আমি ও আমার স্ত্রী গাড়িতে করে জুমআর নামাযের জন্য মিশন হাউসে যাওয়ার সময় প্রায় ১২ কিমি পথে আমরা সব সময় খলীফাতুল মসীহ-র রেকর্ডিং শুনতাম। এবছর ২রা মে পবিত্র রমযানুল মুবারকের শেষে ঈদের দিন আমি বয়আত করি। এটা গত বছরের ঘটনা। তিনি বলেন, আমি আগেই একথা বলতে চাইতাম, কিন্তু কোন না কোন ভাবে এই কাজটি বাকি থেকে যেত। আমি সংক্ষিপ্ত লিখেছি, কিন্তু যা কিছু আমার অন্তরের মধ্যে হচ্ছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি প্রতি নামাযে আল্লাহ্ কাছে ইসলামের বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করে থাকি আর প্রত্যেক জুমআর নামায আমার জন্য নিরন্তরভাবে নিত্যনতুন জ্ঞানের দার উন্মোচন করছে।

প্যারাগুয়ের এক ভদ্রমহিলা লিযা বলেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেকের হিদায়াতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ তৈরী রেখেছেন। ইসলাম আহমদীয়াতের দিকে আমার এই যাত্রা শুরু হয় কোরোনা মহামারির সময়। আমি ভেবেছিলাম অবসর সময়ে কোন ভাষা শেখা উচিত। তাই আমি অনলাইন আরবী শিখতে শুরু করি। আরবীর মাধ্যমেই আমি ইসলামের বিষয়েও অনেক কিছু জানতে পারি। এরপর আমি অধ্যায়ন শুরু করি। এক দিন ফেসবুকের একাউন্ট খুলে দেখলাম সেখানে 'কফি, কেক এন্ড ইসলাম' নামে মসজিদের একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ এসেছে। আমি সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য নথিভুক্ত করলাম এবং যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। সেখানে মুরুব্বী সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। প্রথমে আমার মনে সন্দেহ ও সংশয় ছিল যে, মসজিদে হয়তো কেবল আরবী লোকেরাই প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু সেখানে গিয়ে ইসলামের বিষয়ে যা কিছু জানতে পারলাম তা আমার জন্য একেবারেই নতুন ছিল। আমি জানতে পারলাম যে, ইসলামে ধর্মের বিষয়ে কোন বলপ্রয়োগ নেই আর ইসলাম কেবল শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধর্ম। সেই রাতে আমি যখন মসজিদ থেকে বাইরে এলাম তখন আমার হাতে কুরআন করীম ছিল। এরপর মুরুব্বী সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে স্থায়ী যোগাযোগ ছিল। আমি তাঁকে অনেক প্রশ্ন করেছি, তাঁর সাপ্তাহিক ক্লাসগুলিতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করি। আমি নিজের জন্য একটা লক্ষ্য স্থির করি যে, আমি নামায মুখস্ত করব এবং শিখব। এভাবেই দুই মাস কেটে যায়। আমি প্রতিদিন উঠতে বসতে কেবল ইসলাম সম্পর্কেই চিন্তা করতাম। একদিন আমার স্বামী আমাকে মসজিদের জন্য নিতে আসেন। বাড়ি ফেরার সময় আমি তাঁকে বলছিলাম যে আজ কি কি শিখেছি। একথা শুনে আমার স্বামী আমাকে বললেন, তুমি মুসলমান কেন হয়ে যাচ্ছ না? তাঁর কথায় আমি একেবারে নীরব হয়ে যায় আর আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। কেননা সেই সময় আমি জীবনে কেবল এটাই চাইছিলাম যে, আমি যেন মুসলমান হয়ে যাই। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমার জন্য অনেক বড় বিষয় ছিল। যাইহোক আমি এরপর আহমদী মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমি জামাতের সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করি, গবেষণা করি, প্রশ্ন করি এবং নিয়মিত যুগ খলীফার খুতবা শুনতে থাকি এরপর আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আমি সঠিক পথে আছি, আমার কাছে হিদায়াত আছে, আমাদের একজন ইমাম আছেন যিনি আমাদের প্রতি যত্নবান, যিনি আমাদের পথপ্রদর্শন করেন, আমাদের জন্য দোয়া করেন। যদিও এখনও আমার অনেক কিছুই শেখার আছে, কিন্তু জামাত আহমদীয়ার বিষয়ে আমার মন আশ্বস্ত হয়েছে।' ভদ্রমহিলার বয়আতের কয়েক মাস পর তাঁর স্বামীও বয়আত করেন আর এখন তাঁরা প্যারাগুয়ে জামাতের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় সদস্য।

এরপর কোঙ্গে কানশাসায় বুকাভু শহরের কাছেই ছোট একটি মফসসল শহর রয়েছে। সেখানকার এক ব্যক্তির নাম হল আহমদ বাটাটু সাহেব। তিনি তাঁর আট সদস্যের পরিবার সমেত বয়আত করেন, এমনকি এরপর তিনি তবলীগও শুরু করে দেন এবং তাঁর তবলীগের ফলে আরও ৬২জন জামাতে যোগদান করেছেন। তাঁর কথায়, জামাত আহমদীয়ায় আমার যোগদানের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় কারণটি হল যুগ খলীফার সত্তা এবং খিলাফত ব্যবস্থাপনা। আমীর সাহেব বলেন, আমি তাঁকে অন-লাইন কুরআন পড়াচ্ছি। জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে তিনি সুন্নী মুসলিম ছিলেন। কিন্তু এই কয় বছরে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করতে থেকেছেন যে, সুন্নী মুসলমানরা বিদ্বেষের প্রচার কেন করে? দ্বিতীয়ত, তাদের মধ্যে এত মতভেদ কেন? আর তারা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাদের অনুসরণযোগ্য একজন ইমাম নেই কেন? এই দোটানার মাঝে এম.টি.এ তে খলীফাতুল মসীহ-র খুতবার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হয়। আমার অন্তরাত্মা বলল, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সত্য, কিন্তু অন্তরের অপর কণ্ঠটি বলল, অন্যান্য সকল মুসলমানেরা আহমদীদেরকে কাফের কেন বলে? অবশেষে তানজানিয়ায় এক আহমদী বন্ধুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় এবং ফ্রান্সে একজন আহমদী বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং সবশেষে আমি এলাকার মুবাল্লিগ মুযাম্মিল সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এই বন্ধুরা আমাকে জামাতের বই-পুস্তক পড়তে দেয় আর সেগুলি পড়ার পর এবং গবেষণার পর আমি বয়আত করে নিই।' এরপর তিনি নিজের এলাকায় তবলীগও করেন এবং তাঁর তবলীগে সেখানে জামাত বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোঙ্গে কানশাসার আমীর সাহেব বলেন, সেখানে মাদাম ওয়ানি তিবু সাহেবার সম্পর্ক জামাত আহমদীয়া উভিরার সাথে। বয়স তাঁর বিরাশি বছর। তিনি বলেন, আমি মুসলমান ছিলাম, কিন্তু বিয়াল্লিশ বছর বয়সে খৃষ্টান হয়ে যাই। কেননা আমার ছেলে একটি গীর্জায় পাদ্রী ছিল। একদিন রেডিওতে খলীফাতুল মসীর একটি খুতবার ফ্রেঞ্চ অনুবাদ শুনি। শোনামাত্রই মিশন হাউসে ফোন করে বলি, আমি যুগের ইমামের বয়আত করতে চাই এবং নিজের ছেলেকে বলি, আমি মারা গেলে জামাত আহমদীয়া যেন আমার জানাযা পড়ায়।

ক্যামেরুনের মুবাল্লিগ ইনচার্জ বলেন, সেখানে মারুয়ার এক বন্ধু হলেন উমর জুবের সাহেব। ২০২২ সালের জলসা সালানা ক্যামেরুন এ অংশগ্রহণের জন্য তিনি আসেন। তিনি মুয়াল্লিম সাহেবকে নিজের আহমদী হওয়ার বৃতান্ত শোনান। উমর সাহেব বলেন, এম.টি.এ আফ্রিকার মাধ্যমে আমি জামাতের সম্পর্কে জানতে পারি। আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে খলীফাতুল মসীহ্‌র জুমআর খুতবাগুলি শুনতাম। প্রতি খুতবার সাথে জামাতের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হতে থাকি এবং আমার জ্ঞানও বাড়তে থাকে। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম খুতবা জুমআয় খলীফাতুল মসীহ তাহরীকে জাদীদের ঘটনাবলী এবং তাদের ত্যাগস্বীকারের কথা উল্লেখ করলে খোদা তা'লা আমার কাছে স্পষ্ট করে দেন যে, এই জামাত খোদা তা'লার পক্ষ থেকে, যেখানে লোকেরা ইসলামের জন্য এতবেশি ত্যাগ স্বীকার করছে। এই বিষয়টি থেকে আমার মন পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়ে যায় এবং আমি বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরপর থেকে আমি অনেক আশ্বস্ত এবং আনন্দিত।

সিরালিওন-এর ওয়াটারলু থেকে মুরুব্বি সাহেব লেখেন, সেখানকার আলফা সাহেবকে গত বছর এমটিএ-তে আমার খুতবা শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। আলফা সাহেব সপরিবাারে খুতবা শুনতে আসেন। খুতবা শুনে তিনি ভীষণ প্রভাবিত হন এবং আট সদস্যের পরিবারের সকলেই বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। খোদার কৃপায় আহমদীয়াতে প্রবেশ করার পর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জামাতের সেবার কাজে অংশ গ্রহণ করেন এবং সেখানকার মসজিদ সংস্কারের সময় সর্বক্ষণ নিজেকে সাফাই অভিযানের কাজে নিয়োজিত রাখেন এবং শ্রমিকদের মত কাজ করেন। তিনি নফল রোযাও রাখেন এবং লোকেদের ইফতারির ব্যবস্থাও করেন।

বাংলাদেশের আমীর সাহেব লেখেন, জামাতের তবলীগ সেক্রেটারীর এখানে নিজস্ব একটি ছাপাখানা রয়েছে যেখানে বেলাল নামে এক যুবক কাজ করেন। সেই যুবক জামাতের সম্পর্কে জানতে পারার পর আমাদের মরকযি মসজিদে আসতে শুরু করেন। সেখানে তিনি আমার খুতবা শোনার সুযোগ পান। কিছুকাল পর সে বয়আত করে নেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বয়আত করেন নি। তাদের বিয়ের সাত বছর কেটে গিয়েছিল কিন্তু কোন সন্তান ছিল না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন, খলীফাতুল মসীহকে দোয়ার জন্য লেখা যাক, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদেরকে সন্তান দান করেন। কত লোকে লেখে, আমরাও লিখে পরীক্ষা করি। তিনি তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লেখার এবং দোয়ার আবেদনের বিষয়ে সম্মত করানের পর তিনি দোয়ার জন্য আবেদন করলেন। কয়েক মাস পর তাঁর স্ত্রী সন্তান-সম্ভাবা হন এবং তাঁর স্ত্রীর মনে এই ধারণা তৈরী হয় যে খলীফাতুল মসীহ-র দোয়ার কল্যাণেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। তাই তিনিও বয়আত করে নেন।

বেলজিয়ামের আমীর সাহেব বলেন, মরোক্কোর এক বন্ধু সেখানে থাকেন। তিনি দীর্ঘকাল আহমদীয়াতের বিষয়ে গবেষণা করার বয়আত করেছেন। তিনি বলেন, শৈশব থেকে আমি বিভিন্ন আলেমদের সহচার্যে সময় কাটিয়েছি। কিন্তু খলীফাতুল মসীহর খুতবা শুধু কুরআন করীমেরই তফসীর নয়,বরং মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের দিকেও তা নিয়ে যায় আর তাঁর খুতবা শোনার পর আমি নামাযে আনন্দ পেতে শুরু করেছি।

খোদা তা'লা আমাকে সত্য স্বপ্নও দেখিয়েছেন। আহমদীয়াত আমার জীবন বদলে দিয়েছে। ভদ্রলোক এই কথাগুলি বলার সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

সিরালিওনের কেনেমা থেকে মুরুব্বী সাহেব লেখেন, এক স্থানে পাঁচশর বেশি অ-আহমদী একত্রিত ছিল। সেখানে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল- আহমদীরাই ইসলামের সত্য পথের উপর রয়েছে। আমরা তাদের ঘৃণা করি, কেননা তারা সব সময় সত্য কথা বলে। কোন বস্তু সাদা হলে সেটিকে তারা সাদাই বলে। কিন্তু যখন কোন জিনিস কালো হয় আমরা সেটিকে সাদা বলি। এই কারণেই আমাদের মাঝে সততা এবং ঐক্য নেই। সেই এলাকারই একজন ইমাম সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আপনি যদি আহমদীদের খলীফার খুতবা শোনেন তবে ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি নি, কিন্তু প্রত্যেক জুমআর দিন আমি তাদের খলীফার খুতবা শুনি। আপনারা শুনলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন আর আপনি মন চাইবে না যে খুতবা শেষ হোক।

এরপর মাশাকা অঞ্চলের মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, আমি একটি কাজের জন্য ব্যাংকে যাই। কাজ শেষ হওয়ার পর ক্ষিদে লাগলে হোটেলে খাওয়ার জন্য চলে যাই। সেখানে হোটেলের টিভিতে দেখলাম এম.টি.এর অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে আর মানুষ আমার রেকর্ড করা খুতবা শুনছে। হোটেল প্রবন্ধককে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন, 'আমরা প্রায় এই চ্যানেলটি দেখি আর এতে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলা হয় যা আমাদের জন্য কল্যাণকর, এই চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখতে আমাদের খুব ভাল লাগে।' আল্লাহ্ তা'লা এভাবে জামাতের তবলীগের উপকরণও তৈরী করছেন আর অ-আহমদীদের উপর খিলাফতের গুরুত্ব স্পষ্ট করে দিচ্ছেন।

মালির মুবাল্লিগ মাআয সাহেব লেখেন- এখানকার জিজনি অঞ্চলের এক সদস্য হলেন জালা সাহেব। তিনি বলেন, দুর্ঘটনায় তাঁর এক পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে। অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন। দেশী চিকিৎসা পদ্ধতি ছাড়াও ডাক্তারের কাছেও গিয়েছে। কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পরও হাড় জোড়া লাগছিল না। তিনি ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা এই ভেবে হতাশ হয়ে পড়ে যে হাড় হয়তো আর জোড়া লাগবে না। এরপর একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, খলীফাতুল মসীহ তাঁর জন্য দোয়া করেছেন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নের মধ্যে তাঁর দোয়ার সঙ্গে আমীন বলছি। ঘুম ভাঙ্গতেই আমি আমীন বলে পায়ের উপর হাত বোলালাম। এরপর আল্লাহ্ তা'লা আমার উপর কৃপা করেন। আর হাড় জোড়া লাগছে না বলে যে হতাশা দানা বাঁধছিল তা ক্রমশ দূর হতে থাকে এবং হাড় জোড়া লাগতে শুরু করে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আর কেউ একথা বলতে পারবে না যে আমার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল।' এভাবে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের সতে সম্পর্ক দৃঢ় করার উপকরণ সৃষ্টি করেন।

অ-আহমদীদের উপর এর কি প্রভাব পড়ে? কঙ্গে কিনশাশা-র আমীর সাহেব লেখেন- আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কঙ্গোতে জামাতের রেডিও স্টেশন ছাড়া আরও তেইশটি স্থানীয় এফ.এম এর মাধ্যমে নিয়মিত তবলীগী ও তরবীয়তি অনুষ্ঠান এবং জুমআর খুতবা প্রচারিত হয়। বান্দুন্দু-র দুটি স্থানীয় টিভি স্টেশনে সরাসরি সম্প্রচার হয় আর খুতবার খুব ভাল ফিডব্যাক পাওয়া যাচ্ছে। এক স্থানীয় খৃষ্টান ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হলে তিনি বলেন, আপনাদের ইমামের খুতবা আমি শুনি যা তিনি অত্যন্ত কার্যকরী ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে থাকেন। আপনার কাছে আমার আবেদন, স্থানীয় ভাষাতেও এর অনুবাদ করুন যাতে সমধিক মানুষ এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা এভাবেও ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের উপকরণ তৈরী করছেন। অ-আহমদীরা এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, যুগ খলীফার আওয়াজ মানুষের কাছে দিন। এভাবে পথ মসৃণ হচ্ছে। এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বক্ষ উন্মুক্ত হবে। ইনশাআল্লাহ॥ আর তারা আহমদীয়াত ও প্রকৃত ইসলামকে চিনে নিবে। অতএব, আল্লাহ তা'লা খিলাফতের সঙ্গে কল্যাণের ধারা অব্যাহত রাখার যে প্রতিশ্রুতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে করেছেন তা এমন বিচিত্র উপায়ে পূর্ণ হচ্ছে যে, মানুষের কল্পনা তার আয়ত্ব করতে পারে না। আঁ হযরত (সা.) এর দাসত্বে এসে যিনি পৃথিবীকে এক জাতিসত্তায় পরিণত করবেন বলে অবধারিত ছিল, আপন-পর সকলের এই ঘটনাবলী এবং আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলী এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ নয় তো কি? জামাত আহমদীয়াই একমাত্র জামাত যারা সারা পৃথিবীতে খিলাফত ব্যবস্থার অধীনে ইসলামের উন্নতি ও প্রচারের কাজ করে চলেছে আর প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও যে উন্নতির ধারা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা আল্লাহ্ তা'লার কর্মগত সাক্ষীরই প্রমাণ নয় তে কি? কিন্তু যার চোখ অন্ধ, সে দেখতে পায় না আর না পাবে।

ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জামাত আহমদীয়া আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এবং প্রতিশ্রুতি মসীহ (আ.) দ্বারা সূচিত ও কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থার বিষয়ে আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে চির-প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং কোন শত্রু এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

অতএব, আমাদের সব সময় নিজেদের ঈমানে আরও বেশি ঔজ্জ্বল তৈরীর এবং খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করা উচিত। আর একে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আমরা যেন কোন ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত না হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন।

****

১২৮ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর সমাপনী বক্তৃতা

০৭ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্দী, জলসা সালানা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূরআনোয়ার (আই.) বলেন:আজ আমি বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অধিকারের বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখব যা গত ২০১৯ সালের জলসা সালানার শেষ অধিবেশনে শুরু করেছিলাম। উক্ত বিষয়ে গতকাল লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যকালেও আমি স্বল্প-বিস্তর উল্লেখ করেছিলাম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম সকল শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আর এই সকল অধিকারের বিষয় কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে আমি বর্ণনা করব যেগুলোর ওপর আমল করার ফলে প্রকৃত অর্থে বিভিন্ন শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আমরা ঈমান রাখি এবং বিশ্বাস করি যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পরিপূর্ণ এবং সকল যুগের সমস্যার সমাধানস্বরূপ। কুরআন অনুযায়ী আমল করা ছাড়া না-ই জগতের সমস্যা সমাধান সম্ভব আর না-ই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব। তাই জগতের সম্মুখে এই শিক্ষাকে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের কোনপ্রকার লজ্জা, সংশয় এবং হীনম্মন্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। অধিকারের বিষয়ে আমাদের জাগতিক লোকদের বানানো রীতিনীতি আত্মস্থ করার প্রয়োজন নেই আর না-ই কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আত্মস্থ করার প্রয়োজন আছে বরং পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে জগৎপূজারীদের এবং অধিকার সংরক্ষণকারী নামসর্বস্ব সংস্থাগুলোকে নিজেদের পেছনে চলার আহ্বান করার আবশ্যকতা রয়েছে। যেন সবদিক দিয়ে সকল শ্রেণির লোকের অধিকার সংরক্ষণ হয় আর পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সত্যিকার অর্থে সৃষ্টি হয় এবং প্রতিষ্ঠিত থাকে। একথা সুনিশ্চিত যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ না এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় যে, আমাদের সৃষ্টিকারী একজন স্রষ্টা আছেন এবং তাঁর অধিকার প্রদান করাও আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌র অধিকার কী? তা হল, আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁর ইবাদাতে কাউকে শরীক না করা আর আল্লাহ্‌র স্মরণে লেগে থাকা। তাঁর আদেশ মান্য করা এবং নিষেধ করা বিষয়ে বিরত থাকা। আর আল্লাহ্ তা'লার বিষয়টি যখন উপলব্ধি করা হবে তখন তাঁর বিধিবিধানের ওপর আমল করার দিকেও মনোযোগ সৃষ্টি হবে। আর তাঁর বিধিবিধানের অনেক বড় অংশ তাঁর সৃষ্টির অধিকার প্রদান করা বিষয়ক। আল্লাহ্ তা'লা সেই সত্তা যিনি সকল শক্তির আধার, প্রভু, সবকিছু দানকারী, যাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা প্রত্যেক মানুষের জন্য আবশ্যকীয়। কেননা তিনি তাঁর রবুবিয়্যত, রহমানিয়্যত এবং রহিমিয়্যত-এর দৃশ্য প্রদর্শন করেন। মহানবী (সা.) বলেন, যদি তোমাদের সাথে কেউ সদাচরণ করে অথচ তোমরা যদি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না কর তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌রও কৃতজ্ঞ বান্দা নও। অতএব আল্লাহ্ তা'লা সব জায়গায় আমাদের বলেছেন যে, তোমরা একে অপরের অধিকার প্রদান কর, তবেই আমার অধিকার প্রদানকারী বলে সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যও বান্দার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজের অধিকারও বান্দার অধিকার প্রদানের সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। অতএব এই হল ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা। আর এই হল ইসলামের খোদা, যিনি একে অপরের অধিকার এভাবে প্রতিষ্ঠা করার উপদেশ দেন। এখন আমি কতক অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করব। পূর্বে আমি যে অধিকারের বিষয়টি বর্ণনা করে এসেছি সেখানে আল্লাহ্‌র অধিকারের কিছুটা উল্লেখের পাশাপাশি পিতা-মাতার অধিকার, সন্তানের অধিকার, ছেলেমেয়েদের অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, ভাইবোনের অধিকার, আত্মীয়স্বজনের অধিকার, প্রতিবেশির অধিকার, বিধবাদের অধিকার, বৃদ্ধদের অধিকার, শত্রুর অধিকার, দাস-দাসীর অধিকার, অমুসলিমদের অধিকার বিষয়ক উল্লেখ ছিল। এই অধিকারসমূহের দাবী কিছুটা এমন যে, জাগতিক লোকজন এর ধারেকাছেও আসতে পারে না। এখানেই কথা শেষ নয়, আমি যেভাবে পূর্বে বলে এসেছি, অধিকার বিষয়ক তালিকা আরও দীর্ঘ, যার মাঝ থেকে আমি আজ কিছুটা উল্লেখ করব, যেগুলো প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে ইসলাম ধর্ম নিজ অনুসারীদেরকে উপদেশ দিয়েছে তথা এ অধিকারসমূহ প্রদান কর তাহলে তোমরা নিজেকে প্রকৃত মু'মিন এবং প্রকৃত মুসলমান বলে পরিচয় দিতে পার। বরং আমরা যখন বিস্তারিত বিষয়ের দিকে যাই, তখন উপলব্ধি হয় যে, ইসলাম ধর্ম প্রাণীর অধিকারও সংরক্ষণ করে। আর কেবল আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি বরং ইসলামের অনুসারীরা সেই আদেশ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছে।

যাহোক, যে বিষয় বর্ণনা করার জন্য বা যে সকল শ্রেণির অধিকারের বিষয়টি আমি বেছে নিয়েছি তার মাঝে একটি হল, বন্ধুর অধিকার প্রদান করা।দেখুন, কী বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন যে, তোমাদের প্রকৃত বন্ধু সে-ই হতে পারে যার হৃদয় স্বচ্ছ বা পরিষ্কার। যদি হৃদয় স্বচ্ছ না হয় তাহলে কেমন বন্ধুত্ব হল! আর যাদের হৃদয় স্বচ্ছ তাদেরকে যখন বন্ধু বানাবে তখন তাদের অধিকারও প্রদান করবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছ! নিজেদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিও না। তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কার্পণ্য করে না। তোমাদের কষ্টে নিপতিত হওয়া তাদের পছন্দনীয়। নিশ্চিতরূপে এ বিষয়টি তাদের মুখ থেকে প্রকাশ পেয়ে গেছে। আর যা তারা হৃদয়ে গোপন করে তা আরও ভয়াবহ। নিশ্চিতরূপে এই আয়াত আমরা তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি, হায়! যদি তোমরা বিবেক খাটাতে। (সূরা আলে ইমরান: ১১৯)

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বন্ধুদেরকে নিকটাত্মীয়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে ভ্রাতৃত্বের এমন পরিবেশ সৃষ্টি আদেশ প্রদান করেছেন যার নৈকট্যের প্রেরণাকে বৃদ্ধি করে। বন্ধুত্বের মান কেমন হওয়া উচিত? যখন এভাবে বন্ধুত্ব হয়ে যায় তখন তা প্রতিষ্ঠিত রাখাও আবশ্যক। এ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেন, হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র খাতিরে ভালবাসল, আর আল্লাহ্‌র খাতিরে ঘৃণা করল আর আল্লাহ্‌র খাতিরে কিছু দান করল অথবা আল্লাহ্‌র খাতিরে দান করা থেকে বিরত থাকল, তবে নিশ্চিতভাবে সে তার ঈমান পূর্ণ করল।আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বন্ধুত্বের দাবি পূর্ণ করতে হবে। এই বিষয়টিই প্রকৃত বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে আর রাখেও বটে। এমন অস্থায়ী বন্ধুত্ব কোন বন্ধুত্বই না যেখানে ফাঁটল সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার উদ্দেশ্যে যে বন্ধুত্ব- তা স্থায়ী বন্ধুত্বই হয়ে থাকে। এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, নিশ্চিত আল্লাহ্‌র বান্দার মাঝে এমন অনেকে থাকবে যারা নবী বা শহীদ তো হবে না কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সমীপে নবী এবং শহীদরা তাদের মর্যাদায় ঈর্ষা করবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা কারা? তিনি (সা.) বললেন, যারা আল্লাহ্‌র খাতিরে ভালবাসবে, কেননা তাদের মাঝে না তো আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে আর না-ই কোন লেনদেনের বিষয় থাকবে। আল্লাহ্‌র কসম, তাদের চেহারা নূরান্বিত হবে এবং তাঁরা নূরে পরিপূর্ণ থাকবে। কেয়ামতের দিন মানুষ যখন ভীত থাকবে সেদিন না তাদের কোন ভয় থাকবে আর না-ই তারা চিন্তিত হবে।অতএব এই হল পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার প্রতিফলন এবং আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ। এরপর আবু দারদা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যে মুসলমানই নিজ ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে তখন ফিরিশতা তার পক্ষে দোয়া করে বলে, তোমার জন্যও তাই হোক। এখানে কেবল আপন ভাইয়ের কথা বলা হয় নি, নিজ ভাইয়ের জন্য সাধারণত দোয়া করা হয়। এই ভ্রাতৃত্ববোধে অনাত্মীয় এবং বন্ধুও অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম এমন ভালবাসার ভিত্তি রেখেছে, যার কোন উপমা পাওয়া যায় না, যা একে অপরের জন্য দোয়া করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর ফিরিশতার দোয়া লাভেরও মাধ্যম হয়ে যায়।

এরপর হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ রেখ না, আর হিংসাও কর না আর না-ই পরস্পর গীবত করবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের জন্য নিজ ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা বৈধ নয়।

অতএব এই হল ভাই ও বন্ধুর অধিকার প্রদান করা।

হযরত আবু উসায়েদ মালেক বিন রাবিয়্যা সা'দী বর্ণনা করেন যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর পাশে উপবিষ্ট ছিলাম। বনু সালমা গোত্র থেকে এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের জন্য পুণ্যকর্ম করার কোন সুযোগ আছে? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা। তাদের মৃত্যুর পূর্বে তাদের দ্বারা কৃত অঙ্গীকার তাদের মৃত্যুর পর পূর্ণ করা আর সেই সকল আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা– যাদের সাথে কেবল তাদের কারণেই আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা হত এবং তাদের বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করা।

এখানে কেবল স্বজাতীয় বন্ধুর কথা বলা হয় নি বরং সার্বজনীন বন্ধুর কথা বলা হয়েছে। এই হল বন্ধুদের অধিকার প্রদান করা অর্থাৎ পিতা-মাতার বন্ধুদের অধিকারও তোমরা প্রদান করবে।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, সবচেয়ে বড় পুণ্য হল, মানুষ যেন তার পিতার খাতিরে সুসম্পর্ক বজায় রাখে যদিও তার পিতা মৃত্যুবরণ করুক না কেন।

বংশ পরম্পরায় এই বন্ধুত্বের অধিকার প্রদানের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, প্রকৃত বিষয় হল, আমাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের সম্পর্ক একটি দেহের ন্যায়। এ বিষয়টি আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাই যে, একটি সামান্য অঙ্গে বরং একটি আঙুলেও যদি ব্যথা অনুভূত হয় তাহলে সমস্ত দেহ অস্থির হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা খুব ভালভাবে জানেন যে, ঠিক এভাবেই

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

সর্বদা এবং প্রতিটি মুহূর্তে আমি এই চিন্তায় মগ্ন থাকি যে, আমার বন্ধুরা যেন সব ধরনের স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, এই সহানুভূতি আর এই দুশ্চিন্তা কোন লৌকিকতা এবং অসৎ উদ্দেশ্যে নয় বরং এক মা যেভাবে তার সন্তানদের মাঝে প্রত্যেক সন্তানের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সন্তান যতজনই হোক না কেন, ঠিক সেভাবেই কেবল আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আমার বন্ধুদের জন্য নিজ হৃদয়ে জ্বলন ও দুশ্চিন্তা অনুভব করি। আর এই সহানুভূতি কিছুটা এমন মর্মবেদনার অবস্থায় হয়েছে যে, আমাদের বন্ধুদের পক্ষ থেকে কারও দুঃখকষ্ট বা অসুস্থতা-সম্বলিত পত্র আসে তখন আমার ভিতরে এক অস্থিরতা এবং শঙ্কা সৃষ্টি হয় এবং মর্মপীড়া অনুভূত হয় আর যতই আমার বন্ধুর সংখ্যা বাড়ছে, ততই এই মর্মপীড়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন একটি মুহূর্ত এমন যায় না যখন আমি কোন ধরনের দুশ্চিন্তা এবং বেদনা অনুভব না করি। কেননা এত অধিক সংখ্যায় বন্ধুর মাঝ থেকে কেউ না কেউ যে কোন ধরনের দুঃখকষ্টে নিপতিত হয়-ই। আর সেই খবর জানার পর আমার হৃদয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। কতটা সময় দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে পার করি- আমি তা বলে বুঝাতে পারব না, কেননা আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোন সত্তা এমন নেই, যে এমন দুঃখকষ্ট এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাই আমি সদা দোয়ায় রত থাকি আর আমার সবচেয়ে অগ্রগণ্য দোয়া হল, আল্লাহ্ যেন আমার বন্ধুদেরকে দুঃখকষ্ট এবং দুশ্চিন্তা থেকে সুরক্ষা করেন। কেননা তাদের দুঃখকষ্ট আমাকে মর্মপীড়ায় নিপতিত করে। আর এই দোয়া সর্বান্তকরণে করা হয় যে, যদি কেউ দুঃখকষ্টে নিপতিত হয় তবে আল্লাহ্ যেন তাকে পরিত্রাণ দান করেন। সর্বান্তকরণে এবং পরিপূর্ণ আবেগের সাথে এই মানস তৈরি হয় যে, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি কেননা দোয়া কবুলিয়্যতের ফলে বড় বড় ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।

এ কথাগুলোতো জামা'তের সদস্যদের বিষয়ে তিনি (আ.) বলেছেন। নিজ বন্ধুদের বিষয়ে তিনি (আ.) আরও বলেন, বন্ধুদের সাথে আমাদের সম্পর্ক এতই গভীর যে, বন্ধুদের পরিবার-পরিজন যেন আমাদেরই পরিবার-পরিজন। এই সকল প্রিয়জনদের কারো বিয়োগে আমি এতটাই দুঃখ পাই যতটা কেউ তার প্রিয় সন্তানের মৃত্যুতে দুঃখ পায়।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বন্ধুত্বের মান কেমন হওয়া উচিত- এ বিষয়টি উপমা দিয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "চুরি একটি মন্দ অভ্যাস। কিন্তু বন্ধুর জিনিস যদি অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা হয় তবে তা দোষের নয়।

[সর্বসাধারণের মাঝে এটি দেখা যায় তবেঅন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়া আবশ্যক, যদি অটুট বন্ধুত্ব থাকে তাহলে বন্ধুর অনুমতি ছাড়া কোন জিনিস যদি ব্যবহার করা হয় বা বের করে নেওয়া হয় তাহলে এতে দোষের কিছু নেই, এটি চুরি নয়]।

তিনি (আ.) বলেন, একদা দুই বন্ধুর মাঝে গভীর বন্ধুত্ব ছিল (ঘটনা বর্ণনা করছেন) এবং একে অপরের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। ঘটনাক্রমে এক বন্ধু সফরে যায়। অপরজন বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে আসে এবং দাসীর কাছে জিজ্ঞেস করে, আমার বন্ধু কোথায়? সে বলে যে, সফরে গিয়েছে। বন্ধু সেই দাসীকে জিজ্ঞেস করে, তার টাকা রাখা সিন্দুকের চাবি কি তোমার কাছে? সে বলে, হ্যাঁ, আমার কাছে আছে। সেই বন্ধু দাসীকে দিয়ে সিন্দুক আনিয়ে নিল এবং তার কাছ থেকে চাবি নিল এবং সিন্দুক থেকে কিছু টাকা নিয়ে নিল। বাড়ির মালিক বন্ধু যখন ফেরত আসল, তখন দাসী বলল, আপনার বন্ধু ঘরে এসেছিল। একথা শুনে বাড়ির মালিকের চেহারা ফিকে হয়ে গেল এবং জানতে চাইল, বন্ধু এসে কী বলেছে? দাসী বলল, সে এসে আমার কাছ থেকে সিন্দুক আর চাবি নিয়ে আপনার টাকার সিন্দুক থেকে কিছু টাকা নিয়ে গেছে। ঘরের মালিক উক্ত দাসীর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হল, কারণ সে তার বন্ধুর কথামত কাজ করেছে, তাকে অসন্তুষ্ট করে নি, বন্ধুকে বিফলমনোরথ ফেরত পাঠায় নি। সন্তুষ্ট হয়ে সেই দাসীকে সে স্বাধীন করে দিয়ে বলল, তুমি আজ যে পুণ্যকর্ম করেছ, এর প্রতিদানে আমি তোমাকে আজই স্বাধীন করে দিচ্ছি।"

অতএব এমন বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের দাবি পূর্ণ করা আবশ্যক। বন্ধুর অধিকারের বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কত চমৎকারভাবে বলেন, আমার বিশ্বাস হল, যে ব্যক্তি আমার সাথে একবার বন্ধুত্বের বন্ধন রচনা করে, সেই বন্ধুত্ব রক্ষা করা আমার জন্য এতটাই বাধ্যতামূলক হয়ে যায় যে, সে যা-ই হোক আর যেমনি হোক না কেন, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, সে যদি নিজ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সেক্ষেত্রে আমি নিরুপায়। অন্যথায় আমার ধর্ম হল, আমার বন্ধুদের মাঝে কেউ যদি মদ পান করে এবং বাজারে পড়ে থাকে আর লোকেরা ভিড় করে তাকে ঘিরে থাকে সেক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করে আমি তাকে তুলে নিয়ে আসব। বন্ধুত্বের বাঁধন খুব মুল্যবান সম্পদ। সহজে তা বিনষ্ট করা উচিত নয়। আর বন্ধুর মুখ থেকে যে অশোভনীয় কথাই কানে আসুক না কেন তা চোখ-কান বন্ধ করে উপেক্ষা করা উচিত। অচেনা মানুষ তো এমন কথা বলবে না, এখানে বন্ধুবান্ধবের কথা বলা হচ্ছে।

এই হল বন্ধুর অধিকারের মান। একবার বন্ধু বলে সম্বোধন করেছেন তো জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেই সম্বন্ধ অটুট রাখবেন। মহানবী (সা.)ও বলেছেন যে, সন্তানদের দায়িত্ব হল, নিজ পিতা-মাতার বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের অধিকার প্রদান করবে- এ বিষয়টি আমি আগেও বলেছি।ইসলাম ধর্ম রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করেছে তবে অসুস্থ ব্যক্তিদের অধিকার প্রদান করেছে।যদি কেউ অসুস্থ থাকে তাহলে রোযা রাখার ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে, যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ

অর্থ: গণনার কয়েকটি দিন মাত্র। কিন্তু তোমাদের মাঝে যে-ই অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তাদের জন্য আবশ্যক হল, তারা অন্য সময়ে এই রোযা পূর্ণ করবে।

(সূরা আল বাকারা: ১৮৫)

অতএব ইসলাম ধর্ম অসুস্থ ব্যক্তির অধিকার প্রদান করেছে তথা তার জন্য ছাড় দিয়েছে। অসুস্থ ব্যক্তিকে রোযা রাখতে বাধ্য করে নি। রোযার ক্ষেত্রে অনেকে নিজের ওপর বোঝা চাপিয়ে নেয়, এটি তাদের অন্যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, তাই তোমরা যদি সফরে অথবা অসুস্থাবস্থায় রোযা রেখে নাও তবুও পরবর্তীতে তোমাদের সেই রোযা পূর্ণ করতে হবে। এছাড়া সমাজে অসুস্থ ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি রয়েছে, তাদের ছোট ছোট মনোবাঞ্ছা থাকে, সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করারও আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) একবার এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তিনি (সা.) বললেন, তুমি কী চাও? সেই অসুস্থ ব্যক্তি বলে, আমি গমের রুটি খেতে চাই। [এই হল তৎকালীন সাহাবীদের অবস্থা, গমের রুটিও তাদের জন্য সহজলভ্য ছিল না, গমের রুটি যেন খেতে পারি- এতটুকুই আকাঙ্ক্ষা ছিল] তখন মহানবী (সা.) ঘোষণা করলেন যে, যার কাছে গমের রুটি আছে সে যেন তার এই ভাইয়ের কাছে তা পৌঁছে দেয়। [এটি সাধারণ জিনিস ছিল না যে, সব ঘরেই থাকবে, তাই বললেন, যার কাছে আছে সে যেন তার ইচ্ছা পূর্ণ করে] এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের কাছে কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি কিছু খেতে চায় তবে তাকে তা খাওয়াও।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন: কোন ব্যক্তি

যখন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় তখন ঊর্ধ্বলোক থেকে একজন ঘোষণাকারী বলে ওঠে, তুমি খুব ভাল মানুষ, তোমার চালচলন খুব ভাল আর তুমি জান্নাতে নিজের ঘর নির্মাণ করে ফেললে।

অতএব অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে আল্লাহ্ তা'লা এভাবে পুরস্কৃত করেন। এছাড়া অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দোয়া করাও অসুস্থ ব্যক্তির অধিকারের মাঝে পড়ে। এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ কী ছিল? হযরত আয়েশা বিনতে সা'দ বর্ণনা করেন, তার পিতা সা'দ (রা.) বলেন,

"একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং তখন আমি মক্কায় অবস্থান করছিলাম। মহানবী (সা.) আমাকে দেখতে এলেন। তিনি (সা.) তাঁর পবিত্র হাত আমার কপালে রাখলেন, এরপর আমার বুকে ও পেটে হাত বুলালেন আর দোয়া করে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! সা'দকে তুমি আরোগ্য দান কর এবং তার হিজরতকে পূর্ণতা দান কর" মহানবী (সা.) তার দীর্ঘায়ু লাভের দোয়া করেছেন।

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং তার অধিকার প্রদান করা কত বড় প্রতিদান লাভের কারণ হয়, এ বিষয়ে হযরত আলী (রা.) বলেন, "আমি মহানবী (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি, যে নিজ অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে গেল, সে জান্নাতের ফল আহরণের মৌসুমে বাগানের মাঝে ততক্ষণ বিচরণ করবে যতক্ষণ সে না বসে। এরপর যখন সে বসে পড়ে তখন রহমত তাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। যদি প্রভাতকাল হয় তাহলে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে, আর যদি সন্ধ্যাকালীন সময় আর সে রোগী দেখতে যায় তাহলে সকাল হওয়া পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে।"

অতএব অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার এই হল প্রতিদান। এরপর রোগী দেখতে গেলে কী করতে হবে, এ বিষয়ে আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, রোগী দেখার পরিপূর্ণ পদ্ধতি হল, তোমাদের মাঝে যে তাকে দেখতে যাবে সে তার হাত রোগীর কপালে রাখবে [পূর্বের হাদীসেও এরূপই বলা হয়েছে] এরপর তার হাতে হাত রাখবে এবং তার কুশল জিজ্ঞেস করবে। এরপর তোমাদের উভয়ের হাত মেলানো তোমার পক্ষ থেকে এক পরিপূর্ণ উপঢৌকনস্বরূপ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোগীদের অধিকার কিভাবে প্রদান করতেন এ সম্পর্কিত একটি রেওয়ায়াত রয়েছে, "এক কোরাইশী সাহেব একবার বেশ কিছুদিন ধরে দারুল আমান-এ অসুস্থাবস্থায় ছিলেন আর হুযূরের কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। তিনি অনেকবার হুযূরের কাছে দোয়ার অনুরোধ করেন আর মসীহ্

মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমি দোয়া করব। একদিন সন্ধ্যার সময় হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর মাধ্যমে তিনি নিবেদন করেন যে, আমি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখার সৌভাগ্য লাভ করতে চাই কিন্তু পা ফুলে থাকার কারণে আমি তার কাছে নিজে যেতে পারছি না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটি শুনে পরেরদিন নিজেই তার ঘরে গিয়ে তাকে দেখার প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েই খোদ্দামদের সাথে নিয়ে তার ঘরে যান, যেখানে অতিথি অপেক্ষা করছিলেন এবং তিনি অনেকক্ষণ পাশে বসে রোগীর খবরাখবর নেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) সাহেব বলেন, রোগীকে দেখার জন্য হুযূর অনেক সময় সফর করেছেন। লুধিয়ানায় মীর আব্বাস আলী সূফী সাহেব নামের এক ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমদিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে তার অনেক সুসম্পর্ক ছিল। তার অসুস্থ হবার চিঠি পেয়ে তিনি (আ.) নিজে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও এবং অনেক ব্যস্ততা সত্ত্বেও বন্ধুত্বের দাবির প্রতি এতটা যত্নবান ছিলেন যে, তাকে দেখার জন্য লুধিয়ানায় যাওয়া আবশ্যক মনে করেন। এরপরে মুফতি সাহেব লিখছেন যে, ১৮৮৪ সনের ১৪ই অক্টোবর হুযূর (আ.) লুধিয়ানায় মীর সাহেবকে দেখার জন্য যান এবং তার খবরাখবর নিয়ে আবার ফেরত চলে আসেন। আল্লাহ্‌র ফযলে মীর সাহেব সুস্থ হয়ে যান।

এরপরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোগী ও অসুস্থ লোকদের প্রাপ্য কতটা সতর্কতার সাথে প্রদান করেন এ সম্পর্কে মৌলভী আব্দুল কারীম শিয়ালকোঠী সাহেব লিখেছেন যে, অনেক সময় ঔষধ নিতে আসা মহিলারা দরজায় অনেক জোরে কড়া

নাড়াত আর উচ্চস্বরে হুযূরকে বলত, মির্জা সাহেব দরজা খুলুন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এমনভাবে ছুটে আসতেন যেভাবে কোন দাস মনিবের ডাকে সাড়া দেয়। আর তিনি হাসিমুখে তাদেরকে সাথে কথা বলতেন এবং তাদের ঔষধ প্রদান করতেন। তিনি লিখেন, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও সময়ের মূল্য বোঝে না। আর যারা গ্রাম্য মানুষ তারা তো বেশি সময় নষ্ট করে থাকে। এক মহিলা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে অনর্থক কথা বলা আরম্ভ করে দেয়। ঘরের এবং সাংসারিক সমস্যার কথা বলতে থাকে। তার শাশুড়ি-ননদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলতে থাকে– এতে হুযূরের অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (আ.) ধৈর্যের সঙ্গে তাদের কথা শুনতে থাকেন এবং ইশারা-ইঙ্গিতেও এটি বলতেন না যে, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে, তোমাদের ঔষধ আমি দিয়ে দিয়েছি তোমরা চলে যাও। শিয়ালকোটী সাহেব লিখেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) কখনও বলেন নি যে, তোমাদের আর কি কাজ আছে? শুধু শুধু আমাদের সময় নষ্ট করছ।

একবার গ্রাম্য মহিলারা সন্তানদের নিয়ে তার কাছে আসে, ভিতর থেকে কয়েকজন খাদেমা শরবত নিয়ে বেরিয়ে আসে। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দ্রুত একটি ধর্মীয়পুস্তক লেখার ছিল। আমিও দৈবক্রমে সেখানে যাই আর দেখি, হুযূর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন যেভাবে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকে, সেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এবং ৪/৫টি সিন্দুক খুলে রেখেছেন আর সেখানে কিছু শিশি ছিল যেখান থেকে তিনি কাউকে ঔষধ দিচ্ছিলেন আর কাউকে নির্যাস দিচ্ছিলেন। টানা তিন ঘণ্টা পর্যন্ত ঔষধ দিতে থাকেন তাদেরকে, আর হাসপাতাল খোলা থাকে। সবার পরে আমি হুযূরকে বললাম যে, হুযূর! এটাতো অনেক কষ্টকর বিষয় আর এর কারণে আপনার মূল্যবান অনেক সময় নষ্ট হয়। দেখুন! হুযূর কত সুন্দরভাবে আমাকে উত্তর প্রদান করেন। দেখ! এটা তো ধর্মীয় কাজ এবং কত সুন্দর কাজ। মানবসেবা করা, রোগীদের ঔষধ দেওয়া, তাদের খবরাখবর নেওয়া একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। এরা দরিদ্র মানুষ আর এখানে কোন হাসপাতাল নেই। এদের জন্য আমি সকল প্রকার এলোপ্যাথিক এবং দেশীয় ঔষধ আনিয়ে রাখি যেন যথাসময়ে তা কাজে লাগে। তিনি (আ.) বলেন, এটি একটি পুণ্যের কাজ। এ ধরনের কাজে মু'মিনদের কখনই উদাসীনতা ও অলসতা দেখানো উচিত নয়।

শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব বলেন, লালা মালাওয়ালাম যার বয়স ২২ বছর ছিল। একবার তিনি অসুস্থ হলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রীতি ছিল, তিনি সকাল-সন্ধ্যা জামাল নামক এক সেবকের মাধ্যমে তার খবর নিতেন আর দিনে একবার নিজে গিয়ে তাকে দেখে আসতেন। এটি স্পষ্ট বিষয় যে, লালা মালাওয়ালাম ভিন্ন ধর্মের মানুষ ছিল কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে যেহেতু তার আসা-যাওয়া ছিল তাই মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তার সম্পর্ক ছিল। দেখুন! তিনি কত মানবিক সহানুভূতি পোষণ করতেন। এখানে শুধু রোগীর কথাই বলা হচ্ছে না বরং মসীহ্ মাওউদ (আ.) বন্ধুত্বের খেয়ালও রেখেছেন। ভিন্ন ধর্মের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার বন্ধুত্বের দাবি পূরণ করেছেন এবং রোগী দেখার দায়িত্ব পালন করেছেন। বন্ধুত্বের এত খেয়াল করতেন যে, তার ঘরে গিয়ে তাকে দেখে আসতেন এবং নিজেই তার চিকিৎসা করতেন। একদিন লালা মালাওয়ামাল বলেন, তাকে একটা ঔষধ দেওয়া হয়েছে আর এর ফলাফল যা হয়েছে তা হল, সে রাতে ১৯ বার টয়লেটে যায় এবং শেষে রক্ত বের হওয়া শুরু হয় আর সে অনেক দুর্বল হয়ে যায়। প্রতিদিনের মত সকালে যখন হুযূরের খাদেম তার খবর নিতে যান তখন তার সামনে প্রকৃত খবর তুলে ধরা হয় এবং বলে, হুযূর যেন তাকে দেখতে যান। হুযূর তাৎক্ষণিকভাবে তার সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তার অবস্থা দেখে তিনি অনেক কষ্ট পান। সে বলে, তখন আরও কিছু ঔষধের সাথে মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসুবগুল আমাকে খেতে দেন এরপর আমার রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধুত্ব; প্রতিবেশীর অধিকার এবং রোগীর যে প্রাপ্য– এভাবেই তিনি তা প্রদান করেছেন।

শেখ ইয়াকুব আলীর ইরফানি সাহেব আবার বলছেন, লালা শরমপথ রায় একদা অসুস্থ হয়ে যায়। তার পেটে একটি ফোঁড়া বের হয়। আর এই ফোঁড়া অনেক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। হুযূর (আ.) সংবাদ পেয়ে নিজেই শরমপথ রায়ের বাসায় যান। খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি তাকে দেখে আসেন। তিনি অনেক আতঙ্কিত ছিলেন আর ভাবতেন যে, তিনি মারা যাবেন। উৎকণ্ঠার মধ্যে তিনি এমন কথা বলতেন। তখন হুযূর (আ.) তাকে আশ্বস্ত করেন আর বলেন, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি ডাক্তার আব্দুল্লাহ সাহেবকে নিযুক্ত করছি, তিনি আপনার ভালভাবে চিকিৎসা করবেন। তখন কাদিয়ানে তিনিই একমাত্র বড় ও ভাল ডাক্তার ছিলেন। দ্বিতীয় দিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ডাক্তারের সঙ্গে আসেন। তিনি শুধু ডাক্তারকে একাই পাঠিয়ে দেন নি বরং নিজেও ডাক্তারের সঙ্গে এসেছিলেন। ডাক্তারকে বিশেষভাবে শরমপথ রায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব প্রদান করেন। এর কোন দায়িত্ব শরমপথ রায়ের ওপর চাপানো হয় নি এমনকি খরচের ভারও না। প্রতিদিন বিনা ব্যতিক্রমে হুযূর (আ.) তাকে দেখতে যেতেন আর যখন ক্ষত ঠিক হওয়া আরম্ভ হয় আর তার নাজুক অবস্থা সুস্থতায় রূপান্তরিত হতে থাকে তখন তিনি (আ.) কিছুদিন পরপর যেতেন, কিন্তু তিনি তাকে ততদিন পর্যন্ত দেখতে যান যতদিন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠেন। এটি হল বন্ধুত্ব রক্ষার ও রোগীকে দেখাশুনা করার উত্তম দৃষ্টান্ত এবং এই দায়িত্ববোধ তিনি (আ.) এভাবেই পালন করতেন।

মহানবী (সা.) যে পাঁচটি বিষয়কে এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের প্রাপ্য আখ্যায়িত করেছেন সেই পাঁচটির মধ্যে একটি হচ্ছে রোগীকে দেখতে যাওয়া। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, এক মুসলমানের প্রতি আরেক মুসলমানের পাঁচটি করণীয় বিষয় রয়েছে। ১) সালামের উত্তর দেওয়া ২) ডাকার সাথে সাথে লাব্বায়েক বলা ৩) জানাযায় উপস্থিত হওয়া ৪) রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং ৫) যে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে তার প্রত্যুত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

এর পরবর্তী যে অধিকারের বিষয় আমি উল্লেখ করব তা এতিমদের অধিকারসম্পর্কে। এতিমদের অধিকার বা প্রাপ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কী বলেন? তিনি বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ

অর্থ: আর এতিম প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত যথাযথ পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া (তার) ধনসম্পদের কাছেও যেও না।

(সূরা আন'আম: ১৫৩)

অর্থাৎ, কোন এতিমকে যদি লালনপালন করতে হয় এতিমের সম্পদ যদি থাকে তাহলে এতিমের লালনপালনের নামে তোমরা তার সম্পদ ভক্ষণ করো না। কোন মানুষের যদি আর্থিক সচ্ছলতা থাকে তাহলে নিজের পয়সায় এতিমের লালনপালন করা উচিত। এটি সবচেয়ে উত্তম পন্থা আর যদি কারো সঙ্গতি না থাকে আর এতিমের সম্পত্তি থেকে যদি ব্যয় করতে হয় তাহলে সাবধানে ব্যয় করবে। শুধু ততটুকুই ব্যয় কর যতটুকু লালনপালনে ব্যয় হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলছেন,

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

অর্থ: আর তোমরা (এতিমদের অধিকার সংরক্ষণের) সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন না করে এতিমের ধনসম্পদের কাছে যেও না। সে পরিপক্ব না হওয়া পর্যন্তও (তার ধনসম্পদের কাছে যেও না) এবং তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, কেননা অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জবাবদিহি করা হবে।

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৫)

এখানে বিষয়টা আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, শুধু অবৈধভাবে এতিমদের সম্পদ খাবে না বরং তার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে। এতিম যখন সাবালক হয়ে যাবে তখন তার সম্পদ তার হাতে তুলে দিতে হবে।

এতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের একটি অর্থ হল, যে লাভজনক পন্থায় তার সম্পদ বিনিয়োগ করা যায় তা কর আর এতিমকে লালনপালন করার এটি একটি পন্থা ।করআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

অর্থ: তাঁরই ভালবাসায় তারা অভাবী, এতিম এবং বন্দীদের খাওয়ায়। এটি মু'মিনের একটি মর্যাদা যে, প্রয়োজন সত্ত্বেও ত্যাগ স্বীকার করে তারা অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। (সূরা আদ্ দাহর: ৯)

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ

অর্থ: সাবধান! আসলে তোমরা এতিমদের সম্মান কর না।

(সূরা আল্ ফজর: ১৮)

অর্থাৎ, তোমরা যদি এতিমদের সম্মান না কর, তাদের অধিকার আদায় না কর তাহলে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। তাই সাবধান থাক। করআনে বর্ণিত হয়েছে,

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ

অর্থ: অতএব এতিমের প্রতি তুমি কঠোর হয়ো না। (সূরা আয্ যোহা: ১০)

অতএব কত সুন্দরভাবে আল্লাহ্ তা'লা এতিমদের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, তারা সমাজের অনেক দুর্বল বরং দুর্বলতম শ্রেণি। উপনীত বয়সে পদার্পণ না করা পর্যন্ত তাদের দেখাশোনা করা এবং তাদের সকল অধিকার প্রদান করা– এটি মু'মিনদের জন্য আবশ্যক শর্ত।

এরপর দেখুন! কত সুন্দরভাবে মহানবী (সা.) কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে এতিমদের দেখাশোনা করার উপদেশ প্রদান করেছেন। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে এসব কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.)-এর স্ত্রী হযরত যয়নাব (রা.)-এর পক্ষ হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, আমি মসজিদে ছিলাম, আমি হুযূর (সা.)-কে দেখেছি, তিনি বলতেন, তোমরা মহিলারা সদকা কর তা তোমার অলঙ্কার দিয়ে হলেও। হযরত যয়নাব (রা.) আব্দুল্লাহসহ কতক এতিমদের দেখাশোনা করতেন। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তিনি ব্যয় করতেন আর এ কারণে তিনি আব্দুল্লাহকে বলেন, হুযূরকে জিজ্ঞেস কর, আমার পক্ষ থেকে কি সেই সদকা দিতে হবে, নাকি আমি যে এতিমদের লালনপালন করি, তাদের জন্য ব্যয় করি এটাই যথেষ্ট হবে? হযরত আবদুল্লাহ বলেন, তুমি নিজেই মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস কর। তখন আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই। দরজায় একজন আনসার নারীকে দেখি যার প্রশ্নও আমার অনুরূপ ছিল। সে-ও প্রশ্ন করতে চাচ্ছিল। ততক্ষণে বেলাল আমাদের পাশ দিয়ে যায় আমরা তাকে বললাম, আমাদের পরিচয় উল্লেখ না করে তুমি মহানবী (সা.)-

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

কে জিজ্ঞেস কর, আমাদের পক্ষ থেকে এটাই কি যথেষ্ট হবে না যে, আমি আমার স্বামী এবং এমন কিছু এতিম যারা আমার কাছে আছে তাদের জন্য ব্যয় করি। তখন বেলাল (রা.) ভিতরে যান আর মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, সেই দুই নারী কারা যারা প্রশ্ন করছে? হযরত বেলাল (রা.) বলেন, যয়নাব, হুযূর বলেন কোন্ যয়নাব? হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.)-এর স্ত্রী যয়নাব। তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ! তার জন্য দুটি পুরস্কার নির্ধারিত আছে। একটি নিকটাত্মীয় হবার জন্য পুরস্কার পাবে আরেকটি সদকা হিসেবেও পুরস্কার পাবে। সে যে ব্যয় করছে– তার পুরস্কার অবশ্যই পাবে।

এছাড়া হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, এতিমদের দেখাশোনাকারী আর আমি জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করব যেভাবে এই দুটি একসঙ্গে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি শাহাদত আঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে দেখিয়ে বলেন, এ দুটি যেভাবে একসঙ্গে রয়েছে আমি এবং সেই ব্যক্তি যে এতিমদের দেখাশোনা করে জান্নাতে এভাবে একসঙ্গে থাকব। শুধু শিক্ষাই দেন নি বরং এর বাস্তব দৃষ্টান্তও তিনি (সা.) দেখিয়েছেন।

হযরত অওম বিন আবু জুহায়ফা (রা.) তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আমাদের কাছে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে সদকা সংগ্রহকারী এসে ধনীদের কাছ থেকে যাকাত নিয়ে গরিবদের মাঝে বিতরণ করছিল। আর আমি এতিম ছিলাম তাই তিনি আমাকে সেই সম্পদ থেকে একটি উটনী দিয়েছিলেন। সেই যুগে এটি কোন সাধারণ বিষয় ছিল না যে, একটি উটনী দিয়ে দেয়া হবে তা-ও আবার একজন এতিম ছেলেকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন এতিমকে খাবার খাওয়াবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি দুই দুর্বলের অধিকার সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করে থাকি। এক হচ্ছে এতিম অপরটি মহিলা বা নারী। যদি অধিকার প্রদান না কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির আওতায় চলে আসবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম গৃহ সেটি যেখানে কোন এতিম থাকে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা হয়। আর মুসলমানদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট গৃহ সেটি যেখানে কোন এতিম থাকে এবং তার সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়। হুযূর (সা.) এটি এতটা অপছন্দ করেছেন! এতিমের অধিকার যারা প্রদান করে না তাদেরকে তিনি (সা.) কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন।

এরপর এতিমদের যারা লালনপালন করে তাদের সুসংবাদ দিতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, এতিমদের মধ্য থেকে তিনজনকে যে লালনপালন করবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সারারাত দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করে, দিনের বেলায় রোযা রাখে আর নিজের তরবারি ধারণ করে সকাল-সন্ধ্যা জেহাদে বের হয়েছে। আমি এবং সেই ব্যক্তি জান্নাতে সেভাবেই ভাই হব যেভাবে এই দুই আঙ্গুল অর্থাৎ তিনি (সা.) শাহাদত আঙ্গুল আর মধ্যমা আঙ্গুল একত্রিত করে দেখান।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা একস্থানে বলেছেন,

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○
اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا

অর্থ: আর তাঁরই ভালবাসায় তারা অভাবী, এতিম এবং বন্দীদের আহার করায়। (আর তারা বলে,) আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের আহার করাই। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও চাই না।

(সূরা আদ্ দাহর: ৯-১০)

এর অর্থ হল, আমরা কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষী। এখন চিন্তা করা উচিত, এসব আয়াত দ্বারা কত সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, পবিত্র কুরআন উন্নত মানের ঐশী ইবাদাত বা আমলের সালেহ্‌র জন্য এটি শর্ত রেখেছে যে, ঐশী ভালবাসা ও খোদা তা'লার সন্তুষ্টি যেন তোমাদের হৃদয়ের বাসনা হয়। আল্লাহ্ তা'লা এই ধর্মের নাম ইসলাম এজন্যই রেখেছেন যাতে মানুষ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অধীনে খোদা তা'লার ইবাদত না করে বরং স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই করে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য একটি উদ্দীপনা যেন কাজ করে, কেননা সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করার পর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের নামই হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এমন হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে খোদা তা'লার রহমত বর্ষণের জন্য মু'মিনদেরকে সাধারণ উপকরণাদি নিয়ামত হিসেবে দিয়েছেন কিন্তু মু'মিনদের মধ্যে যারা উন্নত মর্যাদা পেতে চায় তাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে, যেন তারা ব্যক্তিগত ভালবাসার খাতিরে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে এবং তাঁর জন্য এতিম মিসকিনদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে। এটি মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা সৃষ্টি করে।

মহানবী (সা.)-এর যুগের ঘটনা, এক এতিম শিশু ছিল যাকে নিয়ে সাহাবীদের মাঝে ঝগড়া বাঁধে। একজন বলে যে, আমি এর লালনপালন করব আর আরেকজন বলে, না আমি লালনপালন করব। অবশেষে মহানবী (সা.)-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। তিনি (সা.) বলেন, সন্তানটিকে সামনে নিয়ে আস। সে যাকে পছন্দ করবে তাকে তার কাছেই দিয়ে দাও।

এভাবে সাহাবীগণ এই দায়িত্ব পালনের জন্য সদা অগ্রগামী থাকার চেষ্টা করতেন। অঙ্গীকার রক্ষার প্রতি ইসলাম জোরালোভাবে আদেশ প্রদান করেআর সকল অর্থে অঙ্গীকার পালন করার নির্দেশ প্রদান করে। অনেক সময় কোন শত্রু চালাকি করে মুসলমানদের সাথে চুক্তি করে, তখনও সেই যুগের খলীফা বলেছেন যে, না সেই অঙ্গীকারও রক্ষা করতে হবে। ইতিহাসে সেই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে একজন হাবশী কৃতদাস এক জাতির কাছে এই প্রতিশ্রুতি দেয়, অমুক অমুক সুযোগ তোমাদের দেওয়া হবে আর যখন ইসলামী সৈন্যবাহিনী সেখানে উপস্থিত হয় তখন সেই জাতির লোকেরা বলে, আমাদের সঙ্গে তো এই চুক্তি করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চায় নি। তখন এই কথা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে উপস্থাপন করা হয়। তিনি (রা.) বলেন, মুসলমানদের কথা মিথ্যা হওয়া উচিত নয়। একজন ক্রীতদাস প্রতিশ্রুতি দিলেও তা আমাদের পালন করতেই হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ে বলেন,

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا
وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى
مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

অর্থ: তবে সেসব মুশরিকের কথা ভিন্ন যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হবার পর তারা তোমাদের সাথে কোন প্রকার চুক্তি ভঙ্গ করে নি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করে নি। অতএব তোমরা তাদের সাথে (নির্ধারিত) মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

(সূরা আত্ তাওবা: ৪)

অতএব যারা তাকওয়ার উপরে পরিচালিত তাদের জন্য একটি শর্ত হচ্ছে তারা অঙ্গীকার পালন করে অর্থাৎ এই অধিকার রক্ষা করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি এমন লোককে হত্যা করে যার সঙ্গে তার অঙ্গীকার ছিল, সে জান্নাতের সুবাস পাবে না, অথচ জান্নাতের সুবাস তো এমন যা ৪০ বছরের দূরত্বে থেকেও মানুষ তার ঘ্রাণ পেয়ে থাকে। এতটা বিস্তৃত জান্নাতের সুবাস। তাই যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে সে সেই সুবাস থেকে বঞ্চিত থাকবে।

সাহাবীদের সন্তানদের বরাতে বর্ণিত হয়েছে, তারা তাদের পিতা থেকে বর্ণনা করেছে, এক ব্যক্তির বন্ধু আত্মীয় ছিল, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জিম্মায় থাকা কোন ব্যক্তির ওপর অন্যায় করবে অথবা তার অধিকার প্রদানে কমতি করবে বা তার ওপর সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপাবে কিংবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিবে, আমি সেই ব্যক্তির সাথে কেয়ামতের দিনে ঝগড়া করব। এজন্য যারা জিম্মায় থাকে তাদের সাথেও অঙ্গীকার রক্ষার বিষয় রয়েছে আর এটি রক্ষা করা মুসলমানদের জন্য ফরয।

এরপর তিনি (সা.) অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে এত সতর্ক ছিলেন যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আমানি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যিম্মিদের মধ্য থেকে হত্যার বিপরীতে মুসলমানদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেন এবং বলেন, আমি এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখি, যে নিজের দায়িত্ব অধিক পালনকারী। অর্থাৎ একজন মুসলমান তার জিম্মায় থাকা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল যার কারণে তাকে তিনি (সা.) হত্যা করেছিলেন।

হযরত আরবাজ বিন সুলামি (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে খায়বারের ময়দানে যাই। তাঁর (সা.) সাহাবীগণও তাঁর সাথে ছিল। খায়বারের শাসক ছিল ভীষণ দুষ্টপ্রকৃতির এবং নৈরাজ্যসৃষ্টিকারী। সে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে আর বলে, হে মুহাম্মদ! তোমার জন্য কি এটি বৈধ হবে যে, তুমি আমাদের গাধাকে জবাই করবে এবং আমাদের ফসলাদি নিয়ে নিবে আর আমাদের মহিলাদের হত্যা করবে? এই কথা শুনে মহানবী (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, হে ইবনে আওফ! তুমি তোমার ঘোড়ায় আরোহন করে ঘোষণা কর, 'আর জেনে রেখ! জান্নাত শুধু মু'মিনদের জন্য বৈধ। আর তোমরা সবাই নামাযের জন্য সমবেত হও।' বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা নামাযের জন্য সমবেত হয়। মহানবী (সা.) তাদের সঙ্গে নামায পড়েন, এরপর তিনি (সা.) দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার ক্ষমতার আসনে বসে এমন মনে করছ যে, আল্লাহ্ তা'লা কেবল সেগুলোকেই হারাম করেছেন যা কুরআন করীমে রয়েছে? আর তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি নসীহত করেছি আর তোমাদেরকে বিধিনিষেধ সম্পর্কে বলেছি। অর্থাৎ অনেক আদেশ-নিষেধের বিষয় আমি বর্ণনা করেছি। এগুলোর সংখ্যা এত যে, কুরআন শরীফের সমপরিমাণ বা এরচেয়ে বেশি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা মহাপরাক্রমশালী এবং তিনি তোমাদের জন্যে বৈধ করেন নি যে, তোমরা আহলে কিতাবদের বাড়িতে তাদের অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করবে। এছাড়া তাদের মহিলাদেরও হত্যা করার অনুমতি নেই আর তাদের ফল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করারও অনুমতি নেই। তারা তাদের ওপর নির্ধারিত কর প্রদান করছে তাই এসবের কোন অনুমতি নেই।

এরপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) আমর গোত্রের দুই ব্যক্তিকে মুসলমানের মতই অধিকার প্রদান করেছেন, কেননা তাদের সাথে মহানবী (সা.)-এর চুক্তি ছিল আর এটি তাদের অধিকার। হত্যা করেছিল তাই অধিকার প্রদান করেছেন। অতএব অমুসলিমদের সাথেও চুক্তি পালন করা আবশ্যকীয় এবং এটি তাদের অধিকার। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা যা ইতিহাসে পাওয়া যায় এবং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ও এটি বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, সন্ধিচুক্তি যার সাথেই হোক এমনকি যদি কাফেরদের সাথেও হয় তাহলে তা রক্ষা করতে হবে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কাফেরদের সঙ্গে এই সন্ধিও হয়েছিল যে, তোমাদের ওখান থেকে কোন ব্যক্তি যদি আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হয় তবে আমরা তাকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিব আর আমাদের কেউ যদি তোমাদের সঙ্গে

গিয়ে মিলিত হয় তাহলে তোমরা তাদেরকে রাখতে পারবে। এটি অনেক কঠিন শর্ত ছিল। সমঅধিকারের চুক্তি ছিল না। চুক্তিনামা লেখা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তখনও স্বাক্ষর করা হয় নি। এমতাবস্থায় আবু জান্দল নামের এক ব্যক্তি যাকে লোহার শিকল পরিহিত অবস্থায় বেঁধে রাখা হত এবং যিনি ইতিমধ্যে অনেক দুঃখকষ্ট বরণ করেছিলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে তিনি ছুটে আসেন এবং নিজের কষ্টকর পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যান, কেননা এরা আমার মুসলমান হবার কারণে আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। সাহাবীরাও বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! একে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়া উচিত। সে কাফেরদের হাতে অনেক নির্যাতন সহ্য করেছে। তখন তার পিতা বলে, আপনারা যদি একে নিজেদের সাথে নিয়ে যান তাহলে গাদ্দারী করা হবে যা আপনার চুক্তিভঙ্গের কারণ হবে। সাহাবীরা বলেন, এখনও চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা হয় নি। সে বলে, লেখা হয়েছে স্বাক্ষর হয় নি তো কি হয়েছে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, একে ফিরিয়ে দাও। আমরা চুক্তির কারণে একে নিজের কাছে রাখতে পারি না। এর পিতা ঠিক বলছে। এতে সাহাবীরা অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আর মহানবী (সা.) যখন মদিনায় আসেন, তখন সে আবার কোনভাবে পালিয়ে মদিনাতে আসে তখন তাকে নেয়ার জন্য দুই ব্যক্তি তার পিছনে পিছনে আসে। তারা মহানবী (সা.)-কে বলে, আপনি আমাদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন আমাদের লোকদেরকে আপনি আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। হুযূর (সা.) বলেন, হ্যাঁ! ঠিক তাই। তোমরা তাকে নিয়ে যাও। যে মুসলমান ছুটে এসেছিল সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এরা আমাকে অনেক কষ্ট দেয় এবং আমার ওপর নির্যাতন চালায়। এদের সঙ্গে আমাকে ফেরত পাঠাবেন না। হুযূর (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ প্রদান করেছেন আমি যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করি। এজন্য তুমি তাদের সঙ্গে ফিরে যাও। সে ফেরত যায় এবং পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফিরে আসে। এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার সঙ্গে তার সন্ধিচুক্তি ছিল আর আপনি তা পূরণ করেছেন কিন্তু এদের সঙ্গে আমার যেতে হবে, আমার এমন কোন চুক্তি ছিল না। তাই আমি তাদের সঙ্গে যাব না। এরপর অপরজন তাকে ফেরত নেয়ার জন্য আসে তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি তোমাকে আমাদের কাছে রাখতে পারব না। আবার তিনি তাকে তাদের সঙ্গে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু সেই ফেরত নিতে আসা ব্যক্তি একা তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নি। সে থেকে যায় বরং বর্ণনায় পাওয়া যায়, এরপর সে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল কিংবা মদীনায় কিন্তু সেখানে ছিল না। আর মহানবী (সা.)-ও তাকে বারবার বলেছিলেন, আমি যে চুক্তি করেছি তা ভঙ্গ করতে পারব না। তিনি কাফেরদের সঙ্গে চুক্তির কারণে একজন মুসলমানের চরম বিপদ দেখেও তিনি তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় একটি শর্ত ছিল, আরবের যেকোন গোত্র চাইলে মহানবী (সা.)-এর দলে মিলিত হতে পারবে আবার যেকোন গোত্র চাইলে মক্কায় গিয়ে কাফেরদের সাথে যোগ দিতে পারবে। দুই পক্ষের দায়িত্ব হল, তারা পরস্পর তো ঝগড়াবিবাদ করবেই না বরং আর যারা যে পক্ষের সাথে মিলিত হচ্ছে তাদের সঙ্গেও ঝগড়াবিবাদ করবে না। মক্কার লোকেরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মুসলমানদের একটি বন্ধু-গোত্রের ওপর আক্রমণ করে বসে। তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করে এবং তিনি তার মিত্র গোত্রকে সাহায্য করার জন্য মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধ করা তাদের অধিকার ছিল। সর্বোপরি মুসলমানদের জন্য তাদের অধিকার পাইয়ে দেয়া এবং মক্কাবাসীদের অধিকার ভঙ্গ করার শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক ছিল। যাহোক মক্কাবাসীরা যখন সন্ধান পায় তখন তারা আবু সুফিয়ানকে পাঠায়। সে মসজিদে নববীতে এসে ঘোষণা করে, আমি যেহেতু চুক্তির সময় উপস্থিত ছিলাম না তাই নতুন করে সন্ধিচুক্তি করতে হবে। কিন্তু মুসলমানেরা বলে, শিশুসুলভ কথা বল না। চুক্তি তো করা হয়ে গিয়েছে আর তোমরা তা ভঙ্গ করেছ। তখন সে চরম লজ্জিত হয়ে ফেরত চলে যায় আর এর ফলেই মক্কা বিজয় হয়েছিল।

এরপর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অধিকার রয়েছে। সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহ হয়েই থাকে আজকাল যেসব যুদ্ধ হয় এগুলো শুধু নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং সীমানা বৃদ্ধির লড়াই। বর্তমানে তো একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করার জন্য যুদ্ধ করে থাকে। তারা অধিকার প্রদানের কথা বলে ঠিকই কিন্তু মূলত অধিকার খর্ব করে। কিন্তু ইসলাম যে যুদ্ধের অনুমতি দেয় তা শুধুমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। যুদ্ধের পাশাপাশি শত্রুদের অধিকার প্রদানের কথাও ইসলাম বলে থাকে। যখন প্রথম যুদ্ধ করার অনুমতি অবতীর্ণ করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

(সূরা আল্ হাজ্জ: ৪০)অর্থ: যাদের বিরুদ্ধে (বিনা কারণে) যুদ্ধ করা হচ্ছে এখন তাদের (আত্মরক্ষামূলক) যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল, কেননা তাদের ওপর অন্যায় করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

অর্থ: (অর্থাৎ) সেইসব লোক যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেওয়া হয়েছে যে তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি মানুষের একদলকে আর একদল দিয়ে প্রতিহত করা না হত তাহলে সাধুসন্ন্যাসীদের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ধ্বংস করে দেওয়া হত আর মসজিদসমূহও (ধ্বংস করে দেওয়া হত) যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তাঁকে (ধর্মের পথে) সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা শক্তিধর, মহা পরাক্রমশালী।

(সূরা আল্ হাজ্জ: ৪১)

আল্লাহ্ বলেন, তাদের যদি লাগামহীন ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কোন ধর্মীয় উপাসনালয় আর অবশিষ্ট থাকবে না। এরা আক্রমণ করে সবকিছু ধ্বংস করে দিবে। আল্লাহ্ তা'লা ইনসাফের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কখনও অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায়বিচার কর। এ (কাজটি) তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

(সূরা আল্ মায়েদা: ৯)

যুদ্ধের সময় মানুষের অধিকার প্রদানের বিষয়ে কথা হচ্ছে। মহানবী কিভাবে তাদের সে অধিকার প্রদান করেছেন! সোলেমান বিন বুরাইদা তার মায়ের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন কোন অভিযানে কাউকে আমির নিযুক্ত করতেন তখন তাকে বিশেষভাবে খোদাভীতির কথা বলতেন এবং সাথী মুসলমানদের মঙ্গলের নসীহত করতেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নামে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে। যুদ্ধ কর কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কর না, অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না, কারও অঙ্গচ্ছেদ কর না এবং কোন শিশুকে হত্যা করবে না। মুশরিক শত্রুদের সঙ্গে যখন তোমাদের যুদ্ধ হবে তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাও। তিন শর্তের যেটি তারা মানবে তুমিও তাদের সাথে একমত হও এবং থেমে যাও। আর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর। তারা যদি তোমার কথা মান্য করে তাহলে তুমি তা গ্রহণ কর এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাক। তাদেরকে নিজেদের এলাকা থেকে মুহাজির এলাকায় আসার কথা বল আর বল, তারা যদি এমন করে তাহলে তারা মুহাজিরদের অনুরূপ অধিকার পাবে। আর তাদের দায়িত্ব তাই হবে যা মুহাজিরদের দায়িত্ব। যদি তারা স্থানান্তরিত হতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বল, এক্ষেত্রে তোমাদের সাথে মরুবাসীদের মতোই ব্যবহার করা হবে। তাদের ওপরও আল্লাহ্ তা'লার একই নির্দেশ জারি করা হবে যা মু'মিনদের জন্য কল্যাণকর। আর তারা গনিমতের সম্পদ এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে কিছুই পাবে না কেবল তা ব্যতিরেকে যা তারা মুসলমানদের সাথে মিলে গিয়ে জিহাদ করে অর্জন করে। আর যদি তারা এরূপ করতে অসম্মত হয় তবে তাদের কাছ থেকে জিযিয়া কর দাবি করবে আর যদি তারা কথা মেনে নেয় তাহলে তোমরা মেনে নাও এবং তাদের ওপর হামলা করা থেকে বিরত থাক। আর যদি তারা অস্বীকার করে তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আর যদি তোমরা দূর্গবাসীদের সুরক্ষিত কর আর তারা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আশ্রয় চায় তাহলে আল্লাহ্‌র রসূলের জিম্মায় দিবে না বরং তোমাদের নিজেদের এবং নিজ সাথীদের জিম্মায় রাখবে। এর কারণ কি? কারণ হল, তোমরা যদি তোমাদের নিজেদের ও নিজ সাথীদের জিম্মা রক্ষা করতে না পার তাহলে এটি তার চেয়ে বেশি পাপ হবে যদি তোমরা রসূলের জিম্মা পূরণ করতে না পার। আর কোন দুর্গকে যখন তোমরা পরিবেষ্টন কর আর তারা যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশের ওপর আমল করার অনুমতি চায় তাহলে তোমরা তাদের আল্লাহ্‌র নির্দেশের অধীনে আনবে না বরং তোমাদের আদেশের অধীন কর কেননা তোমাদের জানা আছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক তোমরা তাদের সুরক্ষা করতে পারবে কি না। তিনি (সা.) তাদেরকে যতটা নমনীয় হওয়া যায় ততটা নমনীয় হবার উপদেশ প্রদান করেছেন।

আরেকটি রেওয়ায়াতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) লুটপাট ও অঙ্গচ্ছেদ করতে বারণ করেছেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আয়েয (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী যখন কোন যুদ্ধবাহিনী প্রেরণ করতেন তখন বলতেন, মানুষের প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করবে। তাদের ওপর ততক্ষণ হামলা করবে না যতক্ষণ না তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। এই কারণে যে, পৃথিবীর সকল মানুষ ঘরে থাকুক বা তাদের স্ত্রী-সন্তানদের কয়েদী করে নিয়ে আসা হোক এবং তাদের পুরুষদের হত্যা করার চাইতে তদের মুসলমান হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে বের হও। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ধর্ম সাথে নিয়ে বের হও আর কোন দুর্বল, কোন শিশু, কোন নাবালক এবং কোন মহিলাকে হত্যা করবে না। তোমরা খেয়ানত করবে না এবং মালে গণিমত একত্রিত করে রাখবে। আর নিজেদের পরিবারের সংশোধন করবে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহকারীকে ভালবাসেন।

আবার আরেকটি বর্ণনায় হযরত আসওয়াদ বিন সারীক (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) হুনায়েনের যুদ্ধে একটি দলের যাত্রা করালেন। তারা মুশরেকদের

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 13 July, 2023 Issue No.28

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হত্যা করে আর এই হত্যা মুশরেকদের সন্তানদের হত্যা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল। তারা যখন ফেরত আসে তখন হুযূর (সা.) তাদের বলেন, কেন তোমরা শিশুদের হত্যা করেছ? তোমাদের তো এই অধিকার ছিল না বরং তোমরা এই শিশুদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছ। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তারা তো মুশরেকদের সন্তান ছিল। তখন হুযূর (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা এখন উত্তম ব্যক্তিরা আছ তারা কি মুশরেকের সন্তান নও? সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের (সা.) জীবন! পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি জীবনই একই স্বভাবের হয়ে জন্মায়, যতক্ষণ না তার মুখনিঃসৃত কথার মাধ্যমে সে ধর্ম বদলায়।

হযরত রেবা বিন রাবিস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে তিনি একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি (সা.) দেখলেন, কিছু লোক এক জায়গায় একত্রিত হয়েছে। তখন তিনি (সা.) এক ব্যক্তিকে পাঠালেন সে যেন গিয়ে দেখে সেখানে এত ভীড় কেন? তিনি দেখে এসে জানান, সেখানে একজন মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে যার কারণে মানুষ একত্রিত হয়েছে। হুযূর (সা.) বললেন, তাকে কেন মারা হয়েছে, সে তো যুদ্ধও করে নি। লোকেরা বলল, সামনে খালেদ বিন ওয়ালিদের যুদ্ধব্যূহ। তখন হুযূর (সা.) বলেন, তাকে বলে দাও, কোন মহিলা আর শিশুকে যেন হত্যা করা না হয়।

মক্কা বিজয়ের সময় হুযূর (সা.) খালেদ বিন ওয়ালিদকে বললেন, তুমি মক্কার পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করে সাফায় গিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করবে। আর আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, বাতনে ওয়াদির দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে এবং সামনে গিয়ে হুযূরের জন্য অপেক্ষা কর। তিনি (সা.) সবাইকে নির্দেশ দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কিছু না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ধরনের হাতিয়ার উঠবে না। তিনি (সা.) সাধারণভাবে সবার উদ্দেশ্যে এবং বিশেষত খালেদ (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে এই নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক দিক থেকে ইসলামী সৈন্য মক্কায় প্রবেশ করতে থাকে। যে দিক দিয়ে খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন সেখানে শান্তি ও সৌহার্দ্যের এই বার্তা পৌঁছায় নি, তাই সেখানে কুরাইশদের কেউ কেউ তার মোকাবেলা শুরু করে দিল। এখানে যেহেতু তার মোকাবেলায় ইকরামা বিন আবু জাহল, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা এবং সাহল বিন আমর তাদের সঙ্গীসাথী নিয়ে তার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল তাই তাকেও বাধ্য হয়ে অস্ত্র উঠাতে হয়েছিল। খান্দামা নামক স্থানে যেহেতু ঝোপঝাড় ছিল তাই সেখানে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে শত্রুদের ১২ জন মারা যায়। তাদের পরিণতি দেখে বাকিরা পালিয়ে যায়। এছাড়া আর কারও মোকাবেলা কিংবা প্রতিশোধ নেওয়ার সাহস হল না। এই খবর খালেদ বিন ওয়ালিদ-এর কাছে পৌঁছানোর পূর্বে মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে গেল, আর এই আবেদন জানানো হল, তাকে থামানো না হলে গোটা মক্কাবাসীদের সে মেরে ফেলবে। তৎক্ষণাৎ তিনি (সা.) তাকে ডাকিয়ে এনে বলেন, আমি কি তোমাকে লড়াই করতে নিষেধ করি নি? তখন খালেদ (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অবশ্যই নিষেধ করেছেন কিন্তু এরাই আগে আমাদের ওপর হামলা করে আর তির বর্ষণ শুরু করে। আমরা ধৈর্য ধরি আর বলি, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করতে চাই না। তোমরা এমন আচরণ বন্ধ কর, কিন্তু তারা আমাদের কথা শুনে নি বরং অনবরত তির মারতেই থাকে। তাই তাদের সাথে লড়াই করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। মহানবী (সা.) তাদের এই কারণকে গ্রহণ করেন। এই ঘটনাটি ছাড়া আর কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে নি। বাকী সব সেনাপ্রধান নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ নিজ স্থানে এসে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে মিলিত হন। আর সূর্যোদয়ের কিছু পরেই মক্কা মুকাররমা মুসলমানদের করায়ত্তে এসে যায় এবং পূর্ণ বিজয় লাভ করে। বর্তমানে আপত্তিকারীরা তো ইসলামের ওপর আপত্তি করতেই থাকে এমনকি কোন রাখঢাক ছাড়াই তারা হাসপাতাল কিংবা স্কুলে হামলা করে বসে। আকাশবোমা নিক্ষেপ করে, দালানকোঠা গুড়িয়ে দেয়, ঘরবাড়িতে শিশু ও মহিলাদের হত্যা করে। তারা কারও অধিকার আছে বলে মানতেই চায় না– অথচ তারাই ইসলামের ওপর আপত্তি উত্থাপন করে? মহানবী (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের মত এত অধিক অধিকার সংরক্ষণকারী আর কে আছে?

যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ইসলাম ধর্ম কীভাবে শত্রুদের অধিকার সংরক্ষণ করেছে তা দেখুন!হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বক্তব্যের সারাংশ বর্ণনা করছি। (১)কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের জন্য দেহ বিকৃত বা অঙ্গচ্ছেদ করার অনুমতি নেই। অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য শত্রুর মৃতদেহের অঙ্গচ্ছেদ করার অনুমতি নেই। (২) মুসলমানদের কখনই যুদ্ধের মধ্যে ধোঁকাবাজি করার অনুমতি নেই। (৩)কোন শিশুকে বা কোন মহিলাকে হত্যা করা যাবে না। (৪)পাদ্রী, পণ্ডিত কিংবা অন্যান্য ধর্মের পথপ্রদর্শকদের হত্যা করা যাবে না। (৫) বৃদ্ধ বা শিশু অথবা মহিলাদের হত্যা করা যাবে না। আর সর্বদা শান্তি ও সন্ধির প্রতি মনোনিবেশ হওয়া উচিত।(৬)মুসলমান যখন লড়াইয়ের জন্য যাবে তখন শত্রুদের দেশে যেন ভয়ভীতির সৃষ্টি না করে এবং সাধারণ মানুষদের ওপর কঠোরতা প্রদর্শন না করে। বিনা কারণে যেন জনসাধারণকে ভয় না দেখায়। (৭)যখন যুদ্ধের জন্য বের হয় তখন লোকদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে এমন জায়গায় যেন আক্রমণ না করে এবং এমন স্থান দখল না করে যাতে মানুষের জন্য পথচলা মুশকিল হয়ে যায়। রাস্তার মধ্যে যেন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। ভয়ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি না করে। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে অনেক কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি এই নির্দেশনার বিপরীতে যাবে সে তার নিজের জন্যই যুদ্ধ করবে, খোদার জন্য নয়। (৮)যুদ্ধের সময় শত্রুদের চেহারায় যেন আঘাত করা না হয়। (৯)যুদ্ধের সময় চেষ্টা করা উচিত শত্রুর যেন অনেক কম ক্ষতিসাধন হয়। (১০)যেসব ব্যক্তিরা বন্দী হয় তাদের মধ্যে নিকটাত্মীয়দেরকে যেন পৃথক না করা হয়। (১১)নিজের আরামআয়েশের চেয়ে বন্দীদের আরামের দিকে যেন বেশি খেয়াল রাখা হয়। (১২)অন্য জাতির প্রতিনিধিদের সম্মান করতে হবে। তারা ভুল করলেও যেন তা ঢেকে রাখা হয়। (১৩)কোন ব্যক্তি যদি বন্দীকে কষ্ট দিয়ে থাকে তাহলে সেই বন্দীকে যেন কোন রকম মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করা হয় অর্থাৎ বিনা কারণে যদি বাজে আচরণ করা হয় তবে সেই বন্দীকে মুক্ত করতে হবে। (১৪)কোন ব্যক্তির কাছে যদি যুদ্ধবন্দীদের রাখা হয় তবে সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়; তাকে যেন তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর সাহাবীরা (রা.) এর ওপরই আমল করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) এই বিধিনিষেধের আলোকেই এগুলোর সাথে আরও যোগ করেন, 'দালান ভাঙবে না এবং ফলদায়ী বৃক্ষ কর্তন করবে না।'

ঈবাদুর রহমানের তফসীর করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লিখেন, ঈবাদুর রহমানের একটি চিহ্ন বলা হয়েছে, সে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না। এটিও আমরা সাহাবীদের জীবনে জাজ্বল্যমান হতে দেখি। তারা এর ওপর এত দৃঢ়ভাবে আমল করতেন যে, যারা তাদেরকে একসময় তরবারির জোরে ধর্মান্তরিত করতে চাইতো তারপরও তারা কেবল তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করতেন যারা বাস্তবিকভাবে যুদ্ধে অংশ নিত। কোন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, সন্যাসী, পণ্ডিত এবং পাদ্রীর ওপর তারা তরবারি চালাতেন না, কেননা তারা জানতেন– ইসলাম কেবল যুদ্ধে অবতরণকারী ব্যক্তিদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি দেয়। অন্যদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ আখ্যা দেয় না। বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রসমূহ যখন নিজেদের শান্তি ও ন্যায়ের প্রতীক বলে দাবি করে এবং যাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যই সৃষ্টি বলে মনে করা হয় তাদের প্রকৃত অবস্থা হল, তারা সর্বদা শত্রুপক্ষকে এটম বোমা নিক্ষেপের হুমকি দিয়ে থাকে। বরং সত্যিকার অর্থে বিগত বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে এটম বোমা নিক্ষেপ করে লক্ষাধিক জাপানি পুরুষ-মহিলা-শিশুকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। আর এখনো বিভিন্ন দেশে যেসব যুদ্ধ হয়ে থাকে যেমন- ইরাক, ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং ইয়ামেন! সেখানে কী হচ্ছে? এসব স্থানে একই কাজ হচ্ছে। আর এগুলোকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার নাম দিয়ে বাহবা দিয়ে বলা হয়, আমরা এরূপ শান্তির কাজ করেছি। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদার যুগে কোনদিন এমন অত্যাচার দেখা যায় নি। তারা ক্ষমতা হাতে পাওয়া সত্ত্বেও কোন পুরুষ, মহিলা কিংবা কোন শিশুকে অন্যায়ভাবে পদদলিত করেন নি। পক্ষান্তরে এরা অন্যায়ভাবে লক্ষাধিক মানুষের রক্তে রঞ্জিত হাতকে ন্যায় ও সাম্যের মূর্তিমান প্রতীক বলে আখ্যা দেয় আর সেই মুসলমানদের যারা কখনও একটি পিঁপড়াকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করে নি– তাদেরকে এরা ডাকাত ও লুটেরা আখ্যা দেয়!

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মনে রাখা আবশ্যক, ইসলাম কেবল তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণের অনুমতি দিয়েছে যারা প্রথমে তরবারি ধারণ করেছে এবং তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে যারা প্রথমে হত্যাকাণ্ডের সূচনা করেছে।

অতএব এই ছিল কিছু অধিকার যা আমি বর্ণনা করেছি আর এগুলোই হল সেই অধিকারসমূহ যা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। অন্যথায় এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কেউ নেই। বিশেষকরে যুদ্ধের অধিকারসমূহ যা আমি বর্ণনা করেছি, তা যদি কোন সরকার না বুঝে এবং অন্যের অধিকার প্রদান না করে তবে গোটাবিশ্ব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিক যার ধ্বংসযজ্ঞতা সকলের কল্পনার বাইরে। আল্লাহ্ তা'লা এসব জাগতিক লোক এবং সরকারের শুভবুদ্ধি দান করুন। তারা নিজেদের আমিত্বের পরিবর্তে মানবতা রক্ষাকারী হোন। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হল, দোয়া করা যাতে এই পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং এক ও অদ্বিতীয় খোদাকে মান্য করে আর মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা বুঝে ও সে অনুযায়ী আমল করে। আর এটিই চিরস্থায়ী কল্যাণ এবং চিরস্থায়ী হওয়ার পন্থা আর পরবর্তী প্রজন্মের স্থায়ীত্বের চাবিকাঠি। আল্লাহ্ তা'লা সকলের বুদ্ধির উদয় ঘটান। পৃথিবীর প্রত্যেক আহমদীকে সকল দিক থেকে আল্লাহ্ নিরাপদে রাখুন এবং তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল অনিষ্ট থেকে প্রত্যেক আহমদীকে এবং প্রত্যেক অত্যাচারীকে পরিত্রাণ দিন, আমীন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir